পরমাণু গবেষণায় ভারত

সমরজিৎ কর

পরমাণু গবেষণায় ভারত

সমরজিৎ কর

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ রবীন বল
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি 1987
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জুন 1988
নতুন মুদ্রণ 1989
প্রচ্ছদ ঃ অলয় ঘোষাল

দাম ঃ ১৫

মুদ্রাকর ঃ
দীপ্তি প্রিন্টার্স
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৪

॥ প্রসঙ্গ কথা ॥

১৯৩০ এর দশকে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন বিজ্ঞানের ইতিহাস একটি শ্রেষ্ঠতম ঘটনা। গোড়ায় এই ঘটনাটি সর্বসাধারণের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তা যে কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে অনেকের কাছেই সেটা ছিল অস্পষ্ট। পরবর্তী ঘটনার পটভূমি হিরোসিমা এবং নাগাসাকি ধ্বংসাত্মক হলেও, এই ঘটনা থেকে বোঝা গেল পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি মানবকল্যাণেও কাজে লাগান যেতে পারে। অতঃপর উদ্যোগ। ১৯৫০ এর দশকে পারমাণবিক বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে শুরু হল বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন। পরে এই কর্মযজ্ঞে ভারতও এগিয়ে আসে। যার নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এবং ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার মত দূরদর্শী বিজ্ঞানী। ডঃ ভাবার পরিকল্পনায় গড়ে উঠল পারমাণবিক শক্তিবিষয়ক গবেষণা এবং উদ্ভাবন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তাল রেখে ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং কুশলীরা এক একটি করে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র গড়ে তুললেন। সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক এমন অনেক প্রকৌশল, যা মাত্র কুড়ি বছরের স্বল্প প্রয়াসে পৃথিবীর কোন দেশ গড়ে তুলতে পারে নি। সমরজিৎ কর প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন এই উদ্যোগগুলি সর্ম্পকে নিজস্ব অভিজ্ঞতাই এই গ্রন্থে বিধৃত করেছেন। একমাত্র ভারতীয় পারমাণবিক গবেষণা এবং তার কল্যাণমূলক বিষয় নিয়ে এ ধরনের গ্রন্থ-ভারতীয় ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হল।

আমাদের বিশ্বাস, তাঁর পরিবেশিত তথ্যাবলী এবং পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত সমসাময়িক জিজ্ঞাসা পাঠক-পাঠিকাদের ভারতীয় পারমাণবিক উদ্যোগ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা যোগাতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থটির মুদ্রণকালে বিশিষ্ট্য লেখক অদ্রীশ বর্ধনের কিছু অভিমত ও সাহায্য আমরা পেয়েছি। এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

রবীন বল

সূচীপত্র

তুতিকোরিনে ভারী জলের গবেষণাকেন্দ্র

প্লাজমা গলনচুল্লী

ধ্রুব এবং সিরাস রি অ্যাকটরস

ধ্রুব রিঅ্যাকটর কণ্ট্রোল কেন্দ্র

ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র ঃ ট্রম্বে

এক

ট্রম্বে।

কে রেখেছিল এই নাম ? বম্বের বিমান বন্দর সান্তাক্রুজে এই প্রশ্নই প্রথম জিজ্ঞেস করেছিলাম জনৈক বিজ্ঞানীকে। ভদ্রলোক প্রশ্নটির জন্যে হয়ত প্রস্তুত ছিলেন না। মুহূর্তের জন্যে নীরব হলেন তিনি। তারপর বললেন, বলা শক্ত। শুনেছি, স্থানীয় লোকেরা বলত তুরুমবে। এই তুরুমবেই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে ট্রম্বে। আর ট্রম্বে মানেই ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র। তবে এত বড় নাম স্থানীয় লোকেরা ঠিক মনে রাখতে পারে না। তাদের কাছে এর একমাত্র পরিচয় 'ভাবা'।

বোম্বের উপকণ্ঠ চেম্বুর থেকে মোটরে দশ মিনিটের পথ। সেই পথেরই এক প্রান্তে বিরাট এলাকা। সংরক্ষিত। নর্থ গেট দিয়ে সেই সংরক্ষিত এলাকায় গিয়ে যখন হাজির হলাম, মনে হল আমি যেন ভিন্ন জগতের অধিবাসী। নিখুঁত। সব কিছুই নিখুঁত। প্রশস্ত পথ। কখনও সোজা, কখনও পাশাপাশি। তাদের দু পাশে গাছের সারি। আর তার ফাঁকে ফাঁকে এক-একটি জ্যামিতি সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে বহুতল বাড়ি। বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ এবং অন্যান্য কর্মীদের আবাস। আছে সেকটর মার্কেট। কয়েক হাজার কর্মীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যা কিছু দরকার সবই পাবেন এখানে। আছে চব্বিশ তলা ছাত্রাবাস। এক পাশে এ তল্লাটের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। নাম ট্রম্বে। আর এক পাশেও পাহাড়। দক্ষিণে আরব সাগরের খাঁড়ি। ইংরেজিতে যাকে বলে ক্রিক। ক্রিকের মাঝখানে অদূরে এলিফেণ্টা পাহাড়।

কড়া সিকিউরিটি পেরিয়ে গবেষণাগারের মূল চত্বর। একটু এগুলেই বাঁ পাশে চোখে পড়বে গগনচুম্বী চিমনি। এই হল পূর্ণিমা। প্লুটোনিয়াম নিষ্কাশনের চুল্লি। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় প্লুটোনিয়াম রিঅ্যাকটর ফর নিউট্রোনিক ইনভেসটিগেশনস ইন মালটিপ্লাইং অ্যাসেমব্লিজ। ১৯৭২ সালে সম্পূর্ণ ভারতীয় চেষ্টায় তৈরি যে চুল্লি কাজ শুরু করে। কাজ শুরুর পর আন্তর্জাতিক পরমাণু বিজ্ঞানী মহলে যা রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিল। তুলেছিল বিতর্কের ঝড়। আরও এগিয়ে গেলে চোখে পড়বে আরও তিনটি পারমাণবিক চুল্লি। জারলিনা এবং সাইরাস। সাইরাসের পাশে এখন শক্তিশালী একটি পারমাণবিক চুল্লি তৈরির কাজ চলছে। আপাতত যার নাম রাখা হয়েছে আর-৫। এখানে চোখে পড়বে ভারতের বৃহত্তম পারমাণবিক ত্বরক যন্ত্র ভ্যাণ্ডি গ্রাফ। একের তিন মাইল লম্বা বহুতল গবেষণাগার মড্যুলার ল্যাব। তার কাছাকাছি একের পর

এক ওয়ার্কশপ। এই সব ওয়ার্কশপেই তৈরী হচ্ছে নানা রকম যন্ত্রপাতি। এই সব ওয়ার্কশপই ভারতের আধুনিক ইলেকট্রনিক শিল্পের সূতিকাগার। দেশকে পারমাণবিক শক্তির ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার বিরাট আয়োজন চলছে ওখানে। কলকাতার লবণহ্রদের ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং নানারকম সাজসরঞ্জামের পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনের কৃতিত্বও এখানকার বিজ্ঞানী এবং কুশলীদের। কাজ চলছে লেজারের ওপর, ম্যাগনেটো হাইড্রোডায়নামিক্স্ বা 'এম এইচ ডি' পদ্ধতির সাহায্যে কিভাবে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যায় তার ওপর গবেষণা।

পারমাণবিক শক্তিই শুধু নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে পরমাণু বিজ্ঞানের সাহায্যে কি ভাবে আরও বেশী এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সে ব্যাপারেও এক ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে এখানকার বিজ্ঞানী এবং কুশলীরা দিনরাত গবেষণা করে চলেছেন। গবেষণা করছেন কৃষি বিজ্ঞানে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে, ধাতু অথবা খাদ্য সংরক্ষণ বিষয়ক বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে।

রেডিয়েশন মেডিসিন ল্যাবোরেটারিতে বসে জনৈক বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনাদের মূল লক্ষ্য তো ছিল পারমাণবিক গবেষণা। তবে এত সব কেন? এসব কাজ তো দেশের অন্য গবেষণাগারেও হতে পারে?

ভদ্রলোকের তাৎক্ষণিক উত্তর: নিশ্চয় হতে পারে। হচ্ছেও তো। কিন্তু আমাদেরও এসব কাজে হাত না দেয়ার কোন মানে হয় না। বরং বলব, অনিবার্য কারণে তা প্রয়োজনও। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল পারমাণবিক গবেষণা। শক্তির প্রচলিত উৎসের বিকল্প হিসেবে এ-দেশে একদিন পরমাণুকে কাজে লাগাতে হবে, ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার এটাই ছিল স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্যে দরকার মৌলিক এবং প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা। তার জন্যেই তৈরি করছি আমরা একের পর এক গবেষণাগত পারমাণবিক চুল্লি। অপ্সরা, জারলিনা, সাইরাস ইত্যাদি। এ সব চুল্লিতে নিয়মিত নানা রকম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হচ্ছে। কৃষি বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা কেউই আজ আর অস্বীকার করতে পারেন না। কোন কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হচ্ছে এখানে যাদের জীবনকাল ক্ষণস্থায়ী। সেই সব বস্তুর সাহায্যে কৃষি বিজ্ঞানের যদি কাজ করতে হয়, অথবা চিকিৎসা বিজ্ঞানের, তা হলে সে সব কাজ এখানেই করতে হবে। অন্তত করার সুযোগ এখানেই বেশি। এই জন্যেই পারমাণবিক গবেষণারও ব্যবস্থা করতে হয়েছে আমাদের।

হ্যাঁ। এটা শুধু একটি মাত্র উদাহরণ। যথা সময়ে এ নিয়ে পরে বিশদ আলোচনা করব। তার আগে বরং এই গবেষণাগারের পরিচালক এবং বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ রাজা রামান্নার মন্তব্যটি শুনুন।

ডঃ রামান্নার ঘরে বসেই কথা বলছিলাম। তিনি বললেন, ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং কুশলীরা যে পৃথিবীর যে কোন দেশের বিজ্ঞানী এবং কুশলীদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, বরং কোন কোন ব্যাপারে আরও বেশি দক্ষ, ভাবা পারমাণবিক গবেষণাগার তা প্রমাণ করেছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল পারমাণবিক প্রযুক্তিতে আমরা স্বয়ম্ভর হব। এখন আমরা স্বয়ম্ভর। কলপক্কমে ফাস্ট রিঅ্যাকটার নিয়ে আমরা কাজ করছি। থোরিয়াম এ দেশে আছে বিস্তর। থোরিয়াম-২৩২। এই থোরিয়ামকে কিভাবে বিভাজনক্ষম ফেরিয়াম ২৩৩-এ পরিণত করা যায়, সে রহস্যের আমরা সমাধান করেছি। আমার বিশ্বাস, অল্প কালের মধ্যেই আমরা থোরিয়াম থেকে পরীক্ষামূলক ভাবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে সমর্থ হব। আর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে থোরিয়াম থেকে আমরা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করব ১৯৯০ নাগাদ। তখন এখনকার মত আমাদের আর ইউরেনিয়ামের ওপর বেশি নির্ভর করতে হবে না।

তা যদি হয়, বলতে হবে, পারমাণবিক গবেষণায় এবং মানব কল্যাণে পারমাণবিক উদভাবনায় ভারত এখন পৃথিবীর প্রথম সারির দেশগুলির মধ্যে অন্যতম।

দেখেছি। ছিলাম পুরো ছয় দিন। এই ছয় দিন ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের যাবতীয় কার্যক্রম বিশদভাবে বুঝে ওঠার চেষ্টা করেছি। দেখেছি, সব কিছুর পেছনেই রয়েছে সুষ্ঠু পরিকল্পনা। বহুমুখী। কিন্তু একই সূত্রে গাঁথা। প্রতিটি কাজ চলছে রুটিন মাফিক। ঘড়ির কাঁটা ধরে। এখানকার পরিবেশ, এখানকার কাজের ধারা পৃথিবীর যে কোন দেশের বিজ্ঞানীর কাছেই আমার মনে হয়েছে ঈর্ষার মত। যে ঈর্ষা মানুষের মনে গর্ববোধ জাগায়। যে ঈর্ষা মানুষকে আশাবাদী করে তোলে। আর সেই সঙ্গে বার বার মনে পড়েছে একটি মাত্র মুখ। হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা।

*

চাই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। প্রয়োজন সুপরিকল্পিত আর্থিক সাহায্য। এদের অভাবেই ভারতীয় বিজ্ঞান অগ্রগতির পথে বাধা পাচ্ছে। কিছুটা অভিমান হয়ত। কিন্তু সুস্পষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গে নিজের ধারণাটি তুলে ধরেছিলেন ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। তুলে ধরেছিলেন আর একজন ব্যক্তিত্বের কাছে। জে আর ডি টাটা। ১৯ অগাস্ট তাঁর কাছে লেখা একটি চিঠিতে ডঃ ভাবা মন্তব্য করেন ঃ সত্যিই যদি আমরা ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি কামনা করি, তবে মৌল অথবা বিশুদ্ধ গবেষণার ওপর আমাদের অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। জানি, তার হয়ত কোন তাৎক্ষণিক প্রাপ্তি নেই। কিন্তু বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে গেলে এটা দরকার। কেন ? সোভিয়েত দেশের দিকে চেয়ে দেখুন না ! আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উদ্ভাবনার ওপর

সে দেশের মানুষ গুরুত্ব আরোপ করলেও মৌল গবেষণাকে কখনই তাঁরা অবহেলা করেন নি।

ওই চিঠিতেই ভাবা ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছিলেন : এক, বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে গবেষণায় সফল হতে গেলে দরকার উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম, সুযোগ সুবিধে এবং সুষ্ঠু পরিবেশ। তার একান্তই অভাব। দুই, বিজ্ঞানীদের ওপর খুব বেশি প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং পঠনপাঠনের চাপ পড়লে উচ্চতর গবেষণায় তাঁদের পক্ষে মনোনিবেশ করা শক্ত। তিন, আর্থিক স্বাচ্ছল্যের অভাব এবং গবেষণাগারগুলির চরম দুর্গতির দরুন অনেক বিজ্ঞানীই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে টিঁকে থাকতে চান না। পেশা হিসেবে তাঁরা প্রশাসন অথবা বাণিজ্যিক সংস্থাকে বেছে নেন।

জে আর ডি টাটা ভাবার এই চিঠির উত্তর দিলেন ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ : আপনার চিঠিতে যে কথা আপনি বলতে চেয়েছেন, তাতে বুঝতে পারছি, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক কিছু ভাল কাজ করার আছে। আপনি অথবা আপনার সতীর্থদের মধ্যে এ ব্যাপারে যদি কোন সঠিক এবং নির্দিষ্ট প্রকল্পের কথা জানান, আমার বিশ্বাস আপনাদের সেই প্রকল্প স্যার দোরাবজি টাটা ট্রাস্ট এবং হয়ত বা স্যার রতন টাটা ট্রাস্টও যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন।

অনুপ্রাণিত হলেন ভাবা। ১২ মার্চ, ১৯৪৪ নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিলেন স্যার দোরাবজি টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান স্যার সোরাব ডি সকলাভালার কাছে। নানারকম প্রসঙ্গ এই প্রকল্পে তুলে ধরেছিলেন তিনি। পারমাণবিক গবেষণা তাদের মধ্যে অন্যতম।

ভাবা লিখলেন, আগামী দুই দশকের মধ্যে এ দেশ যখন সাফল্যের সঙ্গে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে সমর্থ হবে, ভারতকে তখন আর বিশেষজ্ঞের খোঁজে হাত বাড়াতে হবে না। তখন তাঁদের আমরা হাতের কাছেই পেয়ে যাব।

অদ্ভুত দূরদৃষ্টি। ১৯৪৫ সালের অগাস্টে হিরোসিমার ওপর ফেলা হয়েছিল পরমাণু বোমা। আর তার আঠারো মাস আগে বাঙ্গালোরে বসে শুধু পারমাণবিক বিভাজন করা সম্ভব—একমাত্র তার তাত্ত্বিক খবরাখবরের ওপর নির্ভর করে পরমাণু বিজ্ঞানের কল্যাণময়ী ভূমিকার এমন একটি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হয়েছিলেন ভাবা। এই ঘটনার মাত্র এগার বছর পর ১৯৫৬ সালে এ দেশে বসল প্রথম পারমাণবিক চুল্লি 'অপ্সরা'। শুধু ভারতে নয়, সারা এশিয়ায় প্রথম। আর তার তেরো বছর পর ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯-এ তারাপুরে চালু হল প্রথম পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটিই পরমাণু বিজ্ঞান এবং বিশেষ করে পারমাণবিক প্রযুক্তি বিদ্যায় ভারতকে আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করল।

ডঃ রাজা রামান্না বলছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উদ্ভাবনার ব্যাপারে কলকাতার একটি নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রমোহন বসু, কৃষ্ণান। তবে সবচেয়ে আগে জগদীশচন্দ্র এবং সি ভি রামন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে এ দেশে প্রথম যে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হয়েছিল, যে প্রতিষ্ঠান এখন পরিবর্ধিত—সেই ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়ান্স, সেও কলকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরমাণু বিজ্ঞানের সুষ্ঠু চর্চাও প্রথম শুরু হয়েছিল এই শহরেই। ট্রম্বেতে শুরু হল আর এক অধ্যায়।

ভাবার চেষ্টায় এবং তাঁর সুষ্ঠু নেতৃত্বে বোম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত হল টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ। সেটা জুন ১৯৪৫। প্রতিষ্ঠার অল্প দিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি হয়ে দাঁড়াল ভারতীয় পারমাণবিক গবেষণা, বিশেষ করে পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক গবেষণার প্রাণকেন্দ্র। পৃথিবীর বিশিষ্টতমদের মধ্যে অন্যতম। শুরু হল মৌলিক গবেষণা। পৃথিবীর অগ্রণী দেশগুলির কেউই চায় না, বিজ্ঞানের এই বিশেষ ক্ষেত্রে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশ কোন ভূমিকা নিক। বিশেষ কারণে পারমাণবিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কে তারা যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করে কাজ করে চলেছে। অতএব যদি এ ব্যাপারে কিছু করতে হয়, এ দেশের বিজ্ঞানীদের নিজের চেষ্টাতেই তা করতে হবে। জানতে হবে পারমাণবিক বিক্রিয়ার মূল রহস্য। জানতে হবে পারমাণবিক বিভাজনকে নিয়ন্ত্রিত করে কি ভাবে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায় তার গুপ্ত কথা। প্রয়োজন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রযুক্তি। সে ব্যাপারে পয়সা খরচ করেও বিদেশের সাহায্য পাওয়া দুষ্কর। বিপজ্জনক পারমাণবিক বিকিরণের দরুন পরিবেশ যাতে না দূষিত হয়, মানুষ, পশুপাখি, গাছপালার যাতে না কোন রকম ক্ষতি হয়, এ দিকটাও একটা বড় রকমের সমস্যা। এ সমস্যারও সমাধান করতে হবে নিজেদের। পারমাণবিক চুল্লির জন্যে দরকার ইউরেনিয়াম। আকরিক থেকে সেই ইউরেনিয়ামকে নিষ্কাশিত করে বিভাজনযোগ্য বস্তুতে রূপান্তরিত করতে হবে। ভারতে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ কম। আছে থোরিয়াম। পর্যাপ্ত থোরিয়াম। কিন্তু সেই থোরিয়ামকে পারমাণবিক জ্বালানিতে পরিণত করার কলাকৌশল তখনও অজানা। অজানা পৃথিবীর সর্বত্র। এ ধরনের বহু সমস্যা নিয়ে গবেষণার কাজে নেমে পড়লেন টাটা ইনস্টিটিউট অব ফানডামেন্টাল রিসার্চ। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে।

ক্রমে স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দিল। ভাবার পরিকল্পনা মত টাটা ইনস্টিটিউটের পরমাণু বিজ্ঞানীদের একটি বড় রকমের দলকে সরিয়ে আনা হল ট্রম্বেতে। সেটা জানুয়ারি, ১৯৫৪। তৈরি হল পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ

নতুন প্রজাতির চুল্লি কী রকম হবে সে নিয়ে গবেষণা। যে ধরনের চুল্লিতে ধীর গতিসম্পন্ন নিউট্রনের বিক্রিয়া চালান হয়, দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রন দিয়ে তাতে কাজ চলে না। এর জন্যে প্রয়োজন স্বতন্ত্র ধরনের প্রযুক্তি। সে প্রযুক্তিও এখন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অধিগত।

শ্রীপরানজপে বললেন, 'ফাস্ট টেস্ট ব্রীডার রিঅ্যাকটার' থেকে আমরা পাব পঞ্চাশ মেগাওয়াটের মত উত্তাপ শক্তি। সেই উত্তাপশক্তির মোট ষোল থেকে আঠার মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

প্রশ্ন : কবে চালু হবে আপনাদের এই পরীক্ষামূলক চুল্লি ?

উত্তর : মনে হয় ১৯৮৩ সালের মধ্যেই আমরা চালু করতে পারব। এর পর আমাদের লক্ষ্য একটি বড় রকমের ব্রীডার রিঅ্যাকটার তৈরি করা। যে রিঅ্যাকটার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সমর্থ হবে।

প্রশ্ন : এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশ ব্রীডার রিঅ্যাকটার চালু করতে সমর্থ হয়েছে ?

উত্তর : কাজ চলছে বেশ কয়েকটি দেশে। যেমন বৃটেন ইতিমধ্যে একটি আড়াইশো মেগাওয়াটের ব্রীডার রিঅ্যাকটার চালু করেছে। ফ্রান্স আড়াইশ মেগাওয়াট। এক হাজার দুশ মেগাওয়াটের একটি চুল্লি তৈরি করছে এখন। সোভিয়েত দেশে চলছে সাড়ে তিনশ' এবং ছ'শ মেগাওয়াটের দুটি চুল্লি। এক হাজার ছ'শ মেগাওয়াটের একটি চুল্লি তৈরি পরিকল্পনা নিয়েছেন তাঁরা। জাপান এখন আমাদের মত একটি ছোট চুল্লি তৈরি করেছে। এছাড়া তিনশ মেগাওয়াটের মত পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করতে করছে। মার্কিন দেশে আছে চারশ মেগাওয়াটের ব্রীডার রিঅ্যাকটার। আমাদের দেশে যতটা সম্ভাবনা দেখছি তাতে আগামী পঁচিশ বছরে আমরা দু লক্ষ মেগাওয়াটের মত পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করা পারব।

কলপক্কমে তাত্ত্বিক গবেষণারও ব্যবস্থা রয়েছে। এই গবেষণা পারমাণবিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে। পারমাণবিক বিকিরণ যাতে এখানকার কর্মী এবং আশপাশের অঞ্চলের ক্ষতি করতে না পারে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন এখনকার কুশলীরা। টেস্ট রিঅ্যাকটারের চারপাশে আধুনিকতম সাজসরঞ্জাম নিয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণাগার। যা পৃথিবীর যে-কোন দেশের কাছেই গর্বের বস্তু হতে পারে। পাঁচশ বিজ্ঞানী সহ প্রায় দু হাজার একশ কর্মী রাত-দিন কাজ করে চলেছেন এই কলপক্কমে। আজ থেকে দশ বছর আগে কলপক্কমের পরিচয় ছিল—বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অন্যান্য অঞ্চলের মতই একখণ্ড বেলাভূমি। কিছু পামগাছ এবং জেলে পরিবার এই নিয়েই ছিল সেখানকার জনপদ। ঘুমন্ত সেই পরিবেশ এখন সদা জাগ্রত। পারমাণবিক গবেষণার পীঠস্থান।

তিন

ডঃ রামান্নার মুখে ১৮-মে-র সেই অভিজ্ঞতা

সকাল ৮টা বেজে ১৫ মিনিট।

পূর্বনির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুযায়ী এটাই অন্তিম মুহূর্ত। জিরো আওয়ারস্ !

প্রস্তুতির সমস্ত পর্ব ধাপে ধাপে নিখুঁতভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। কোন ত্রুটিই ধরা পড়ে নি। বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ্‌দের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের জন্যে অজস্র টেলিফোনের তার টানান হয়েছিল। মূল লক্ষ্যস্থলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছে মোটা কেবল্। চরম মুহূর্তে এই কেবলের মধ্য দিয়ে সেখানে বিদ্যুৎ শক্তি পাঠান হবে। মুহূর্তের জন্যে কী টেলিফোন ব্যবস্থা, কী বিদ্যুৎ সরবরাহ কোন কিছুতেই এতটুকু ত্রুটি ছিল না।

আগের দিন অর্থাৎ সারাদিন, সারারাত অবিশ্রান্ত সবাই কাজ করে গেছেন। সবাই বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। এমন অবস্থায় মানসিক উত্তেজনা যে থাকবেই, বলা বাহুল্য। শেষ পর্যন্ত কী হয় সেটা দেখার উত্তেজনা।

মূল লক্ষ্যবস্তুর ওপর ঈগলের চোখ রেখে একটি টেলিভিশন ক্যামেরা সেখানকার তাৎক্ষণিক্ ঘটনা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছিল। সবাই সচেতন। সবাই যন্ত্রের মত একের পর এক দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

না, প্রধানমন্ত্রী নন। অথবা ভিন্ন কোন দেশের রাষ্ট্রপতিও নন। ঠিক কোন মুহূর্তে সেই চরম ঘটনাটি ঘটান হবে যাঁর ওপর সেটা নির্ধারণ করার দায়িত্ব, তিনি একজন আবহাওয়া বিজ্ঞানী। কারণ এ ক্ষেত্রে জানা দরকার, বাতাসের গতিবেগ কত। সে বাতাস কোন দিক বরাবর বয়ে চলেছে। এ সব কাজ করার জন্যে সেখানে একটা ছোটখাটো মানমন্দির বসান হয়েছিল।

মূল ঘটনাস্থল থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে উঁচু একটি মাচার মত জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কয়েকজন বিজ্ঞানী অধীর আগ্রহে কাল গুণছি। আমার হাতে বাইনাক্যুলার। তার সাহায্যে চারপাশ, বিশেষ করে সেই ঘটনাস্থলের দিকে মুহুর্মুহু দেখে চলেছি। সেই আরাধ্য বস্তুটি তখন শান্ত সমাহিত—গভীরে। রাজস্থানের মরুভূমির ভূ-স্তরের ৩৫০ ফুট গভীরে।

৮টার কাছাকাছি সময়ে আবহাওয়াবিজ্ঞানী জানালেন, আবহাওয়া অনুকূল। আমরা হিসেব কষে দেখলাম আরও পনের মিনিট অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করা হল, ৮টা পনর মিনিট নয়, ৮টা বেজে ৫ মিনিট। অর্থাৎ অন্তিম মুহূর্তটি দশ মিনিট এগিয়ে আনা হল।

শুরু হল অন্তিম মুহূর্ত গণনা। কাউণ্ট ডাউন।

দশ সেকেণ্ড, নয় সেকেণ্ড···শূন্য সেকেণ্ড—

আমি তখন কাঁপছি। বুকের মধ্যে সজোরে হাতুড়ির আঘাত চলছে।

মুহূর্তগত ব্যাপার। খুবই তাৎক্ষণিক ঘটনা।

সে দেশের মানুষ গুরুত্ব আরোপ করলেও মৌল গবেষণাকে কখনই তাঁরা অবহেলা করেন নি।

ওই চিঠিতেই ভাবা ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছিলেন : এক, বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে গবেষণায় সফল হতে গেলে দরকার উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম, সুযোগ সুবিধে এবং সুষ্ঠু পরিবেশ। তার একান্তই অভাব। দুই, বিজ্ঞানীদের ওপর খুব বেশি প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং পঠনপাঠনের চাপ পড়লে উচ্চতর গবেষণায় তাঁদের পক্ষে মনোনিবেশ করা শক্ত। তিন, আর্থিক স্বাচ্ছল্যের অভাব এবং গবেষণাগারগুলির চরম দুর্গতির দরুন অনেক বিজ্ঞানীই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে টিঁকে থাকতে চান না। পেশা হিসেবে তাঁরা প্রশাসন অথবা বাণিজ্যিক সংস্থাকে বেছে নেন।

জে আর ডি টাটা ভাবার এই চিঠির উত্তর দিলেন ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ : আপনার চিঠিতে যে কথা আপনি বলতে চেয়েছেন, তাতে বুঝতে পারছি, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক কিছু ভাল কাজ করার আছে। আপনি অথবা আপনার সতীর্থদের মধ্যে এ ব্যাপারে যদি কোন সঠিক এবং নির্দিষ্ট প্রকল্পের কথা জানান, আমার বিশ্বাস আপনাদের সেই প্রকল্প স্যার দোরাবজি টাটা ট্রাস্ট এবং হয়ত বা স্যার রতন টাটা ট্রাস্টও যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন।

অনুপ্রাণিত হলেন ভাবা। ১২ মার্চ, ১৯৪৪ নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিলেন স্যার দোরাবজি টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান স্যার সোরাব ডি সকলাভালার কাছে। নানারকম প্রসঙ্গ এই প্রকল্পে তুলে ধরেছিলেন তিনি। পারমাণবিক গবেষণা তাদের মধ্যে অন্যতম।

ভাবা লিখলেন, আগামী দুই দশকের মধ্যে এ দেশ যখন সাফল্যের সঙ্গে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে সমর্থ হবে, ভারতকে তখন আর বিশেষজ্ঞের খোঁজে হাত বাড়াতে হবে না। তখন তাঁদের আমরা হাতের কাছেই পেয়ে যাব।

অদ্ভুত দূরদৃষ্টি। ১৯৪৫ সালের অগাস্টে হিরোসিমার ওপর ফেলা হয়েছিল পরমাণু বোমা। আর তার আঠারো মাস আগে বাঙ্গালোরে বসে শুধু পারমাণবিক বিভাজন করা সম্ভব—একমাত্র তার তাত্ত্বিক খবরাখবরের ওপর নির্ভর করে পরমাণু বিজ্ঞানের কল্যাণময়ী ভূমিকার এমন একটি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হয়েছিলেন ভাবা। এই ঘটনার মাত্র এগার বছর পর ১৯৫৬ সালে এ দেশে বসল প্রথম পারমাণবিক চুল্লি 'অপ্সরা'। শুধু ভারতে নয়, সারা এশিয়ায় প্রথম। আর তার তেরো বছর পর ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯-এ তারাপুরে চালু হল প্রথম পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটিই পরমাণু বিজ্ঞান এবং বিশেষ করে পারমাণবিক প্রযুক্তি বিদ্যায় ভারতকে আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করল।

ডঃ রাজা রামান্না বলছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উদ্ভাবনার ব্যাপারে কলকাতার একটি নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রমোহন বসু, কৃষ্ণান। তবে সবচেয়ে আগে জগদীশচন্দ্র এবং সি ভি রামন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে এ দেশে প্রথম যে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হয়েছিল, যে প্রতিষ্ঠান এখন পরিবর্ধিত—সেই ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়ান্স, সেও কলকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরমাণু বিজ্ঞানের সুষ্ঠু চর্চাও প্রথম শুরু হয়েছিল এই শহরেই। ট্রম্বেতে শুরু হল আর এক অধ্যায়।

ভাবার চেষ্টায় এবং তাঁর সুষ্ঠু নেতৃত্বে বোম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত হল টাটা ইনসটিটিউট অব ফান্ডামেণ্টাল রিসার্চ। সেটা জুন ১৯৪৫। প্রতিষ্ঠার অল্প দিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি হয়ে দাঁড়াল ভারতীয় পারমাণবিক গবেষণা, বিশেষ করে পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক গবেষণার প্রাণকেন্দ্র। পৃথিবীর বিশিষ্টতমদের মধ্যে অন্যতম। শুরু হল মৌলিক গবেষণা। পৃথিবীর অগ্রণী দেশগুলির কেউই চায় না, বিজ্ঞানের এই বিশেষ ক্ষেত্রে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশ কোন ভূমিকা নিক। বিশেষ কারণে পারমাণবিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কে তারা যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করে কাজ করে চলেছে। অতএব যদি এ ব্যাপারে কিছু করতে হয়, এ দেশের বিজ্ঞানীদের নিজের চেষ্টাতেই তা করতে হবে। জানতে হবে পারমাণবিক বিক্রিয়ার মূল রহস্য। জানতে হবে পারমাণবিক বিভাজনকে নিয়ন্ত্রিত করে কি ভাবে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায় তার গুপ্ত কথা। প্রয়োজন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রযুক্তি। সে ব্যাপারে পয়সা খরচ করেও বিদেশের সাহায্য পাওয়া দুষ্কর। বিপজ্জনক পারমাণবিক বিকিরণের দরুন পরিবেশ যাতে না দূষিত হয়, মানুষ, পশুপাখি, গাছপালার যাতে না কোন রকম ক্ষতি হয়, এ দিকটাও একটা বড় রকমের সমস্যা। এ সমস্যারও সমাধান করতে হবে নিজেদের। পারমাণবিক চুল্লির জন্যে দরকার ইউরেনিয়াম। আকরিক থেকে সেই ইউরেনিয়ামকে নিষ্কাশিত করে বিভাজনযোগ্য বস্তুতে রূপান্তরিত করতে হবে। ভারতে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ কম। আছে থোরিয়াম। পর্যাপ্ত থোরিয়াম। কিন্তু সেই থোরিয়ামকে পারমাণবিক জ্বালানিতে পরিণত করার কলাকৌশল তখনও অজানা। অজানা পৃথিবীর সর্বত্র। এ ধরনের বহু সমস্যা নিয়ে গবেষণার কাজে নেমে পড়লেন টাটা ইনসটিটিউট অব ফানডামেণ্টাল রিসার্চ। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে।

ক্রমে স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দিল। ভাবার পরিকল্পনা মত টাটা ইনসটিটিউটের পরমাণু বিজ্ঞানীদের একটি বড় রকমের দলকে সরিয়ে আনা হল ট্রম্বেতে। সেটা জানুয়ারি, ১৯৫৪। তৈরি হল পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ

ভাবে পারমাণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্র। গবেষণা কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু। ২০ জানুয়ারি, ১৯৫৭। দুর্ভাগ্য, তার নয় বছর পর ২৪ জানুয়ারী, ১৯৬৬ ইউরোপে যাওয়ার পথে মণ্ট ব্ল্যাঙ্কে এক বিমান দুর্ঘটনায় ভাবা পরলোকে গমন করেন। ১৯৬৭-র জানুয়ারি মাসে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে ট্রম্বের গবেষণা কেন্দ্রটি উৎসর্গ করা হল। তার নতুন নামকরণ হল ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টার। সংক্ষেপে এখন যার পরিচয় বি এ আর সি।

এ গবেষণাগার পৃথিবীর বৃহত্তম গবেষণাগারগুলির একটি। সুসজ্জিতও। প্রতিষ্ঠার মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত। এর মোট কর্মী সংখ্যা এখন ১১000। তাঁদের মধ্যে ৩000 বিজ্ঞানী এবং এনজিনিয়ার।

*

ভারতে পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প প্রসঙ্গে আপাতত এই প্রতিষ্ঠানটির কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। পরবর্তী অধ্যায়ে এসব নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করব। সেই সঙ্গে সেখানকার বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলে যা বুঝেছি, সেখানকার বিভিন্ন গবেষণাগারে যা দেখেছি তার কিছু কিছু বিবরণ।

১। এপ্রিল ১৯৪৮। ভাবার উদ্যোগে এবং জহরলাল নেহরুর সমর্থনে ভারতে প্রথম রচিত হল অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাকট। বা পারমাণবিক শক্তি আইন।

২। অগাস্ট, ১৯৪৮। পারমাণবিক শক্তি আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হল এদেশের পারমাণবিক শক্তি কমিশন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের অধীনে।

৩। সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮। কেরালার সমুদ্রবেলা থেকে মোনাজাইট (থোরিয়ামের উৎস) রপ্তানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ।

৪। জুলাই, ১৯৪৯। দেশে রেয়ার আর্থ মিনারেল অনুসন্ধানের কাজ শুরু। এ কাজ এখন করছে বি এ আর সি'র অ্যাটমিক মিনারেলস ডিভিশন।

৫। অগাস্ট, ১৯৫০। সরকারী তত্ত্বাবধানে কেরালায় তৈরি হল ইনডিয়ান রেয়ার আর্থ লিমিটেড। মোনাজাইট বালু থেকে রেয়ার আর্থ পৃথক করার দায়িত্ব পড়ল এই প্রতিষ্ঠানটির ওপর।

৬। সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। বিহারে যদুগোড়ায় সন্ধান পাওয়া গেল ইউরেনিয়াম খনির।

৭। এপ্রিল, ১৯৫২। টাটা ইনসটিটিউট অব ফানডামেণ্টাল রিসার্চ পারমাণবিক যন্ত্রপাতি এবং পারমাণবিক চুল্লি নিয়ন্ত্রণের জন্যে গবেষণায় হাত দিল। তৈরি হল ইলেকট্রনিক প্রোডাকশন ইউনিট।

পরে এই ইউনিট ট্রম্বের ইলেকট্রনিক ডিভিশনে সম্প্রসারিত হয়। অবশেষে এখনকার ইলেকট্রনিক কর্পোরেশন অব ইনডিয়া লিমিটেডে।

৮। জানুয়ারী, ১৯৫৪। পরমাণু শক্তি কমিশন পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের উদ্যোগ নিলেন। গবেষণাগার বসল ট্রম্বেতে।

৯। অগাস্ট, ১৯৫৪। পারমাণবিক শক্তি দপ্তর নামে একটি নতুন দপ্তর তৈরি করলেন ভারত সরকার। ঠিক হল পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে এই দপ্তরের সচিব হিসেবে গণ্য হবেন। ডঃ ভাবার ওপর এই দায়িত্বটি এসে বর্তাল।

১০। নভেম্বর, ১৯৫৪। ডঃ ভাবা ভারতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তিন পর্যায়ের একটি পরিকল্পনা রচনা করলেন। প্রথম পর্যায়ে ঠিক হল এমন ধরনের পারমাণবিক চুল্লি তৈরি হোক, যা শুধু শক্তিই উৎপাদন করবে না, সেই সঙ্গে উৎপাদন করবে পারমাণবিক জ্বালানি প্লুটোনিয়াম। এই চুল্লিতে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হবে। উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে থাকে শতকরা ৯৯·৩ ভাগ ইউরেনিয়াম-২৩৮ এবং ০·৩ ভাগ ইউরেনিয়াম-২৩৫। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঠিক হল, এরপর তৈরি করা হবে ফাস্ট রিঅ্যাকটার। যাতে জ্বালানি হিসেবে থাকবে থোরিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম। এই চুল্লিতে তৈরি হবে ইউরেনিয়াম-২৩৩। তৃতীয় পর্যায়ে তৈরি করা হবে ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাকটার। ভারতের থোরিয়াম সম্ভারকে যাতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে পুরোপুরি কাজে লাগান যায় এ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য সেটাই।

১১। মার্চ, ১৯৫৫। কমিশনই ইউ কে'র সাহায্য নিয়ে 'অপ্সরা' চুল্লির কাজে হাত দিলেন। এ ব্যাপারে ইউ কে প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়াম দিয়ে সাহায্য করে। যে ইউরেনিয়ামে ইউরোনিয়াম-২৩৫-এর মাত্রা অনেক বেশি। একেই বলা হয় এনরিচড ইউরেনিয়াম।

১২। অগাস্ট, ১৯৫৫। ট্রম্বেতে থোরিয়াম নিষ্কাশনের কাজ শুরু হল।

১৩। এপ্রিল, ১৯৫৬। কলম্বো প্ল্যান অনুযায়ী কানাডার সঙ্গে 'সাইরাস' চুল্লির কাজে হাত দেয়া হল।

১৪। অগাস্ট ১৯৫৬। 'অপসরা' চুল্লি চালু হল।

১৫। অগাস্ট, ১৯৫৮। ভারত সরকার এ দেশে প্রথম পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

১৬। জানুয়ারি, ১৯৫৯। ট্রম্বের ইউরেনিয়াম মেটাল প্ল্যান্ট পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগে এমন ধরনের ইউরেনিয়াম উৎপাদনে হাত দিল।

১৭। ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০। ট্রম্বেতে তৈরি হল প্রথম প্রস্থ পারমাণবিক জ্বালানি।
১৮। জুলাই, ১৯৬০। 'সাইরাস' চালু হল।
১৯। জানুয়ারি, ১৯৬১। চালু হল আর একটি রিঅ্যাকটার বা চুল্লি। নাম 'জারলিনা' বা জিরো এনার্জি রিঅ্যাকটার ফর ল্যাটিস ইনভেসটিগেসনস অ্যান্ড নিউ অ্যাসেমব্লিজ।
১৯। অগাস্ট, ১৯৬২। নাঙ্গালে হেভী ওয়াটার প্ল্যান্ট উৎপাদন শুরু করল।
২০। অগাস্ট, ১৯৬২। রাজস্থান পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির কাজে শেষ হল।
২১। ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪। ট্রম্বের পারমাণবিক জ্বালানি শোধনাগার তৈরির কাজ শেষ হল।
২২। এপ্রিল, ১৯৬৭। ট্রম্বের গবেষণাগারে পরীক্ষিত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পৃথক ভাবে তৈরি করা হল ইলেকট্রনিক কর্পোরেশন অব ইনডিয়া।
২৩। অক্টোবর, ১৯৬৭। ইউরেনিয়াম খনি থেকে ইউরেনিয়াম সংগ্রহ এবং তার পৃথকীকরণের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হল ইউরেনিয়াম কর্পোরেশন অব ইনডিয়া।
২৪। ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯। তারাপুরের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হল।
২৫। সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। হায়দ্রাবাদে জারকোনিয়াম উৎপাদন শুরু করল নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকস।
২৬। মে, ১৯৭২। 'পূর্ণিমা' চুল্লি চালু হল।
২৭। অগাস্ট, ১৯৭২। রাজস্থানের পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের উৎপাদন শুরু।
২৮। মে, ১৯৭৪। রাজস্থানের পোখরানে মানবকল্যাণে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অসামান্য সাফল্য অর্জন করলেন আমাদের পরমাণু বিজ্ঞানীরা।
২৯। জুন, ১৯৭৭। ভারতীয় পরমাণু বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদরা নিজস্ব নকশা এবং দেশজ চেষ্টায় কলকাতায় চালু করলেন অন্যতম বৃহত্তম সাইক্লোট্রন।

বলা বাহুল্য, সংক্ষিপ্ত এই ঘটনাবলী প্রমাণ করে, পারমাণবিক গবেষণা এবং তার প্রয়োগের ব্যাপারে এ দেশের প্রচেষ্টা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য এবং বাস্তবমুখী।

দুই

কার কাছে যেন শুনেছিলাম কথাটা। গোপনকে কখনও সিন্দুকে আটকাতে নেই। সব চেয়ে গোপন জিনিসটি সবার সামনে রেখে দাও, দেখবে কারোর চোখেই পড়বে না। পড়লেও কৌতূহলী হওয়ার আশংকা থাকে কম।

ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের সেণ্ট্রাল ওয়ার্কশপে ঢুকতেই কথাটা মনে পড়ল বার বার। শুধু আয়তনেই বৃহত্তম নয়। এত বহুমুখী সাজ সরঞ্জাম তৈরির ব্যবস্থা দেশের কোন গবেষণাগারের ওয়ার্কশপে আছে বলে আমার জানা নেই।

জনৈক বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ১৯৭৪ সালের মে মাসে এখানকার বিজ্ঞানীরা রাজস্থান মরুভূমির পোখারানে মানবকল্যাণে পারমাণবিক বিস্ফোরণ-জনিত পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। শুনেছি, ওই পরীক্ষার জন্যে যে সব যন্ত্রপাতি এবং সাজ সরঞ্জাম দরকার হয়েছিল তার অনেক কিছুই তৈরি হয়েছিল আপনাদের এই ওয়ার্কশপে। আপনারা কি জানতেন, ওই সব সাজ সরঞ্জাম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানর জন্যে তৈরি করা হচ্ছে?

কথাটা শুনে মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, ওই পরীক্ষার জন্যে যে সব সাজ সরঞ্জামের দরকার ছিল, তার অনেক কিছুই এই ওয়ার্কশপেই তৈরী করা হয়। এক একটি যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ তৈরির দায়িত্ব ছিল এক একটি দলের ওপর। আমাদের স্পেসিফিকেশন দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে ব্লু-প্রিণ্ট। সেই মত আমরা কাজ করে গেছি। ওসব দিয়ে কি হবে, আগে থেকে আমরা কিছুই জানতাম না। আপনাদের মত আমরাও পারমাণবিক বিস্ফোরণের কথা জেনেছিলাম রেডিওর খবর শুনে।

অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। সারা ট্রম্বের কাজের ধারাটাই এই রকম। দেশের আরও অনেক গবেষণাগারে ঘুরেছি। তাদের ওয়ার্কশপও দেখেছি। ভাল ভাল কর্মী সেখানেও রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে যথেষ্ট উন্নত মানের যন্ত্র-পাতি এবং সাজ সরঞ্জাম তৈরি করাও যায়। কিন্তু করাচ্ছেন কে? মনে পড়ে, কলকাতার কোন একটি নামকরা গবেষণাগারের জনৈক ওয়ার্কশপ কর্মী একবার আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, যা শিখে এখানে কাজে এসেছিলাম এখন ভুলতে বসেছি। স্যাররা, বাজার থেকে অথবা বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনেন, যাদের অনেক কিছুই আমরাই তো তৈরি করত পারি। তাতে খরচও কম পড়ে, আমাদেরও দক্ষতা বাড়ে। অনেক সময় বিদেশী যন্ত্রপাতিও এখানে আনার পর অল্পদিনের মধ্যেই অকেজো হয়ে পড়ে। তখন ডাক পড়ে আমাদের। অনেক স্যার যন্ত্রপাতির জটই মাথায় আনতে পারেন না।

ট্রম্বের ওয়ার্কশপ এ ক্ষেত্রে একটি বড় রকমের ব্যতিক্রম। এখানে কাজ হয়।

এক-একজনের ওপর এক-একটি দায়িত্ব। দায়িত্ব তাঁরা পালন করেন। শুনলাম, পারমাণবিক বিস্ফোরণের উপকরণগুলি যখন তাঁরা তৈরি করছিলেন, বিশেষ কয়েকজন ছাড়া তাদের তাৎপর্য বিস্ফোরণের আগে কেউই বুঝতে পারেন নি। এত ব্যাপক এবং বিচিত্র সাজ সরঞ্জাম এখানে তৈরি হয় যার হিসেব দেওয়া শক্ত। একের পর এক পারমাণবিক চুল্লি তৈরি হয়েছে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, কম্প্যুটার বা যন্ত্রগণক। ব্লু-প্রিণ্ট অনুযায়ী এখানকার কর্মীরা সেগুলি নিখুঁত-ভাবে তৈরি করে গেছেন। কলকাতায় বসল ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন। এই সাইক্লোট্রনের বায়ু-শূন্য ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতির সাজ সরঞ্জাম, রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি প্যানেল প্রভৃতির জটিল যন্ত্রপাতি তৈরি করেছেন এখানকার কুশলীরা। এসব কাজকর্মে এখানকার কর্মীরা এখন দক্ষ। লেজার তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে এখানে। এম এইচ ডি বা ম্যাগনেটো হাইড্রোডায়নামিকস পদ্ধতিকে বিদ্যুৎ শক্তির বিকল্প উৎস হিসেবে কাজে লাগানর চেষ্টা করছেন ভাবা পারমাণবিক গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা। ভারত হেভি ইলেকট্রনিকস লিমিটেডের সহযোগিতায় তিরুচিপল্লীতে এ ধরনের একটি শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বসানর পরিকল্পনাও নিয়েছেন তাঁরা। সম্প্রতি এই ওয়ার্কশপেই তৈরি হয়েছে তুতিকোরিনের ভারী-জল কারখানার তাপ-বিনিময়ক যন্ত্র বা হিট-একসচেঞ্জার। এ কাজ খুবই জটিল। দক্ষতারও প্রয়োজন যথেষ্ট। যন্ত্রটির প্রচণ্ড তাপ সহ্য করার মত ক্ষমতা থাকা চাই। ওঁদের তৈরি এই যন্ত্রটির তাপ-সহন ক্ষমতা প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে ২৩০ কিলোগ্রাম। কাজটি ওঁরা পাঁচ মাসের রেকর্ড সময়ে শেষ করেছেন।

ওয়ার্কশপে ডঃ নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হল। বললেন, গোড়ায় বিদেশী যন্ত্রপাতি আমাদের আনতে হয়েছে। তাদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমাদের কর্মীরা প্রচুর অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন।

এ অভিজ্ঞতা কখনও কখনও যে তিক্তও হয়েছে তারও প্রমাণ পেলাম ওঁদের কমপ্যুটার সেণ্টারে গিয়ে। আমার কাছেও সেটা বড় রকমের এক অভিজ্ঞতা।

সেখানে যেতেই, জনৈক কুশলী আমাকে নিয়ে এলেন বেশ বড় সড় একটি কমপ্যুটারের সামনে। বললেন, এই কমপ্যুটারটিই আমাদের সবচেয়ে বড়। এটি এনেছিলাম আমরা রাশিয়া থেকে। একই জাতের কমপ্যুটার যার সাহায্যে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা স্পুতনিককে আকাশে তোলেন।

তা তুলুন, আপত্তি নেই। কিন্তু ভাবা পারমাণবিক কেন্দ্রের প্রযুক্তিবিদদের শেষ পর্যন্ত অনেক অসুবিধেয় ফেলেছিল এই কমপ্যুটারটি। এর অনেক যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে যায়। কাজকর্মের ব্যাপারেও যথেষ্ট গোলমাল দেখা দেয়। এ সবের নিরসন করতে গিয়ে এই কমপ্যুটারের মেরামতির দায়িত্ব নিতে হয়েছে এখানকার কুশলীদের। বেশ কিছু বিকল্প সাজ সরঞ্জামও তৈরি করতে

হয়েছে তাঁদের।

ঘড়িতে তখন বিকেল পাঁচটা। কিন্তু কোন ক্লান্তি নেই। আধ ডজনেরও বেশি ইনজিনিয়ার সদা তৎপর—কেউ প্রিন্টেড সারকিট নিয়ে, কেউ নতুন তৈরি কমপ্যুটারের যন্ত্রাংশের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষায়। মনে হল, আমি যেন কারখানার মধ্যে বসে আছি। যন্ত্র চলছে। সেই সঙ্গে চলেছে কর্মীদের ব্যস্ততা। সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় এবং দেশজ উপাদানে নানা রকম কমপ্যু-টার তৈরির কাজ চলছে এখানে, যাদের ব্যবহার করা হবে টেলিফোন সার্কিটে, নিউট্রন স্পেকট্রোমিটারে। তৈরি করেছেন একটি বড়সড় লাইব্রেরির সমস্ত বই-এর লেখা একটি মাত্র 'মেমারির' মধ্যে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা। যা আপনার ফোলিওর মধ্যে আপনি বহন করতে পারেন।

না। শুধু কমপ্যুটার সেন্টারেই নয়, ব্যস্ততা এখানে সর্বত্র। দিনের যে কোন সময়ে যখন যে গবেষণাগারে গেছি, দেখেছি সবাই কর্মব্যস্ত। বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ অথবা কর্মী সবাই। সবার হাতেই নতুন ধরনের কাজ, প্রতিশ্রুতির সাক্ষ্য রাখার মত কাজ। যে কাজ কর্মীকে উৎসাহিত করে। যে কাজ করতে ভাল লাগে। এখানকার কর্মতৎপরতার মূল কারণ হয়ত এটাই।

*

ও'রা বলেন, ট্রম্বে কমপ্লেকস। বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে কোথাও রিঅ্যাকটার, কোথাও আইসোমেড, কেথাও রেডিয়েশন গবেষণাগার। এখানকার জন সংযোগ অফিসার, শ্রীরাজ গোড়াতেই বলেছিলেন, পায়ে হেঁটে সব আপনি দেখতে পারবেন না। তাই পরিবহনের ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে আমার ছয় দিনের সফরের জন্যে একজন সারাক্ষণের সঙ্গী। তাঁরই সহ-কর্মী শ্রী এস পারেখ। আমার সফরের দায়িত্ব ছিল তাঁরই ওপর।

শ্রীপারেখ বললেন, আমাদের ডাইরেকটারকে জানিয়েছি, আপনি এসেছেন। হি ইজ্ রেডি টু মিট ইউ এনি টাইম।

ডঃ রাজা রামান্না। ভাবা পারমাণবিক গবেষেণাকেন্দ্রের ডাইরেকটার। প্রথম দিন, গিয়েই দেখা করলাম তাঁর সঙ্গে। কয়েক বছরের পরিচয়। তাই কোন ফরম্যালিটি ছিল না। বললেন, দু দিন আমি একটু ব্যস্ত থাকব। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কার্টারের প্রতিনিধি আসছেন। তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। তুমি বরং তোমার ইচ্ছে মত যতটা পার দেখে নাও। তারপর এখান-কার কাজকর্ম নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব, কেমন ?

মার্কিন প্রতিনিধির কথা শুনে মুহূর্তে সপ্রশ্ন হয়ে উঠলাম, হাও অ্যাবাউট তারাপুর ? হোয়াট অ্যাবাউট এনরিচড্ ইউরেনিয়াম ?

প্রশ্নটি শুনেই খানিকটা যেন বিরক্ত হলেন তিনি। আমার ওপর নয়। প্রসঙ্গটির ওপর। বললেন, আপাতত এ প্রসঙ্গ থাক। পরে বলব। ব্যাপারটা

সুখকর নয়।

সুখকর যে নয় সে কথা সবাই এখন আমরা বুঝতে পারছি। দেশকে কোন ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর করে তুলতে গেলে যে সব প্রযুক্তির প্রয়োজন, তাদের জন্যে বিদেশের ওপর নির্ভর করলে শেষ পর্যন্ত কি নিদারুণ পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, তারাপুর তার একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ। ভারতের প্রথম পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র তারাপুর। এই কেন্দ্রটি তৈরি করার জন্যে আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে কানাডা এবং মার্কিন দেশের ওপর। পারমাণবিক জ্বালানি হিসেবে এখানে ব্যবহার করা হয় এনরিচড ইউরেনিয়াম। অর্থাৎ যে ইউরেনিয়ামে পারমাণবিক বিভাজনক্ষম ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর পরিমাণ থেকে বেশি। উল্লেখ্য, প্রকৃতিতে আকরিক হিসেবে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় তাতে শতকরা ৯৯.৩ ভাগ থাকে ইউরেনিয়াম-২৩৮। ০,৭১ ভাগ ইউরেনিয়াম-২৩৫। তাই আকরিক থেকে সরাসরি পাওয়া ইউরেনিয়ামকে জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগান শক্ত। চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয়, তারাপুর পারমাণবিক চুল্লির জন্যে প্রয়োজনীয় এনরিচড্ ইউরেনিয়াম মার্কিন দেশ সরবরাহ করবে। কিন্তু পোখারানের পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত পরীক্ষার পর শুরু হয়েছে নানা রকম টালবাহানা—এনরিচড ইউরেনিয়াম সরবরাহের ব্যাপারে।

*

'তা যদি হয়, তাহলে তারাপুরের পরিণতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আমাদের দেশেও তো প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। সেই ইউরেনিয়ামকে এনরিচ করে তারাপুরের পারমাণবিক চুল্লির জ্বালানি যোগান কি সম্ভব নয়?' প্রশ্নটি তুলে ধরেছিলাম ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে রিঅ্যাকটার গ্রুপের প্রধান এবং তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ পি আর দস্তিদারের কাছে। ডঃ দস্তিদারের পৈতৃক বাড়ি ছিল এক সময়ে চট্টগ্রামে। এখন ওঁরা বোম্বাই-এর স্থায়ী বাসিন্দা। পারমাণবিক চুল্লি বিষয়ক প্রযুক্তি বিদ্যায় ডঃ দস্তিদার সারা ভারতে এখন শিরোনাম।

ডঃ দস্তিদার বললেন, সম্ভব নয়। আমাদের দেশে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় খুবই কম। আপাতত বিহারের যদুগোড়ার খনির ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। এই খনিতে যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম আছে তাতে আমাদের পঞ্চাশ ষাট বছরের মত চলতে পারে। আমরা ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালাচ্ছি। জিওলজিকেল সার্ভে অব ইনডিয়াও এ ব্যাপারে কাজ করছে। আরও কিছুটা ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। আসল ব্যাপার এই, অবস্থা যা, তারাপুরের জন্যে দরকার এনরিচড ইউরেনিয়াম। পরিমাণে অনেক বেশি। একথা ঠিক, আমাদের প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম এনরিচ করার জন্য হায়দারাবাদে ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের চেষ্টায় বসান হয়েছে নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকস। তার যা উৎপাদন

তা থেকে তারাপুরকে অতটা এনরিচড ইউরেনিয়াম যোগান সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ঃ তা হলে একটা কাজ তো আপনারা করতে পারেন? এনরিচড ইউরেনিয়ামকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে আপনারা বিশেষ ডিজাইনে তৈরি করেছেন তারাপুরের পারমাণবিক চুল্লি। সেই ডিজাইনকে কি এখন পালটে নেওয়া যায় না? ধরুন, এমনভাবে কিছুটা হেরফের ঘটালেন যাতে করে এনরিচড ইউরেনিয়ামের বদলে তাতে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহার করলেও কাজ চলবে? রাজস্থানের রাণাপ্রতাপ সাগরে আপনারা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় যে পারমাণবিক চুল্লি তৈরি করেছেন তাতে তো প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামই ব্যবহার করছেন? আমরা যতটা জানি, প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহার করার মত চুল্লি তৈরির কলাকৌশল আপনাদের জানা। তা হলে অসুবিধেটা কোথায়?

ডঃ দস্তিদার ঃ অসুবিধে অনেক। রাজস্থান এবং তারাপুরের চুল্লির ডিজাইনে অনেক পার্থক্য, পারমাণবিক প্রযুক্তির দিক থেকে কাজ শুধু শক্তই নয়, প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। তার চেয়ে বরং নতুন চুল্লি করা লাভজনক।

প্রশ্ন ঃ ধরুন, বিদেশ থেকে শেষ পর্যন্ত আর এনরিচড ইউরেনিয়াম আমদানি করা গেল না। সে ক্ষেত্রে তারাপুরের পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রটিকে কি বন্ধ করে দিতে হবে?

ডঃ দস্তিদার ঃ আমি দুঃখিত, মিঃ কর। আমার পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব নয়। আপনি তো আমাদের চেয়ারম্যান ডঃ শেঠনার সঙ্গে দেখা করছেন। প্রশ্নটা তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন না?

জিজ্ঞেস করেছি। ডঃ শেঠনার উত্তর, না তারাপুরের চুল্লিকে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহার করার মত চুল্লিতে পরিণত করা সম্ভব নয়। এনরিচড ইউরেনিয়াম না পেলে তারাপুরকে বন্ধ করে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

প্রশ্ন ঃ তার পরিণাম কি হবে, সেটা একবার কি আপনি ভেবে দেখেছেন?

ডঃ শেঠনা ঃ জানি। পরিণাম খুবই খারাপ। তারাপুরের পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করতে আমাদের কয়েকশ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। তার বিদ্যুৎ শক্তির ওপর নির্ভর করে ওই অঞ্চলে তৈরি হয়েছে ছোট বড় অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান। তাতেও খরচ হয়েছে কোটি কোটি টাকা। তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হবে। 'বাট উই হ্যাভ নো অলটারনেটিভ।'

এটা একটা বড় রকমের সমস্যা, সন্দেহ নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে না বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয়, তার জন্যে ধাপে ধাপে বলিষ্ঠ কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে আসছেন ভাবা পারমাণবিক কেন্দ্রের বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ্‌রা।

*

১৯৫৪। পৃথিবীর বিশেষ কয়েকটি দেশ তখন নানারকম পারমাণবিক চুল্লি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। উদ্দেশ্য, পারমাণবিক গবেষণা। ডঃ ভাবা সেই

সব চুল্লির কার্যকারিতা লক্ষ্য করে এদেশেও গবেষণার জন্যে কাজে লাগে এমন ধরনের চুল্লি তৈরির পরিকল্পনা নিলেন। এ কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন ইউ কের অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটি। ওঁরা বললেন, চুল্লির প্রয়োজনীয় এনরিচড ইউরেনিয়াম যোগাবেন তাঁরা। চুল্লিটির যাবতীয় পরিকল্পনার দায়িত্ব নিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। ভারতীয় প্রযুক্তিবিদরা পুরোপুরি নিজেদের চেষ্টায় চুল্লিটি তৈরিও করে ফেললেন। নাম রাখা হল অপসরা। অপসরা ১৯৫৬ সালের আগস্টে কাজ শুরু করে। এতে যে এনরিচড ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয় তাতে ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর পরিমাণ ছিল শতকরা ৮১ ভাগ। চুল্লিতে পারমাণবিক বিভাজনের সময় বেরিয়ে আসে নিউট্রন কণা। সৃষ্টি হয় উত্তাপ। চুল্লিটি ঠান্ডা রাখার জন্যে ব্যবহার করা হল সাধারণ জল। নিউট্রনের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের কাজ সারা হল ওই জলেরই সাহায্যে।

এই রিঅ্যাকটারটি ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। এক, নিউট্রন বিষয়ক গবেষণার সুযোগ, দুই, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটার বিষয়ক প্রযুক্তিবিদ্যায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, এবং তিন, কিছু তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি।

গিয়েছিলাম সাইরাস রিঅ্যাকটারটি দেখতে। কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা। এখানকার ম্যানেজার মিঃ রাও এর সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ করে রেখেছিলেন মিঃ পারেখ। সিকিউরিটি অফিসার আমাকে তাঁর ঘরে পেঁছে দিলেন। সৌজন্য বিনিময়ের পর শুরু হল এক প্রস্থ প্রশ্ন। আচরণে যথেষ্ট ভদ্র এবং মধুরভাষী হলেও প্রথম পরিচয়েই বুঝতে পারলাম, মিঃ রাও শক্ত লোক। প্রচণ্ড তৎপরতা তাঁর কথাবার্তায়। চাহনিতে। মনে হল কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরটা পর্যন্ত যেন খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছেন তিনি, খুঁটিয়ে জেনে নিলেন, (যদিও জানেন আমার সঙ্গে পাশ আছে) কোথা থেকে আসছি, এখানে আসার উদ্দেশ্যই বা কি? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি রেডিয়েশন ফিজিকসের লোক কি না। তারপর সহজ সুরে মন্তব্য করলেন, প্লিজ ডোন্ট মাইনড। উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল ফর সিকিউরিটিজ রিজন।

বললেন, বিপজ্জনক এলাকা এটা। এতটুকু বিপদের আশংকা যাতে না থাকে তার জন্যে সব সময় আমাদের তৎপর থাকতে হয়। জনৈক তরুণ অফিসারকে ডাকলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে গেলাম সাইরাস রিঅ্যাকটারের মূল কক্ষে। তার আগে রেডিয়েশন ব্যাজ পরে নিতে হল। ভেতরে থাকার সময় আমার শরীরে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটলে এই ব্যাজ তা জানিয়ে দেবে।

নিখুঁত ব্যবস্থা। ব্যাংকের ভল্টের মত বিরাট দুটি যান্ত্রিক দরজা। বোতাম টিপতেই খুলে গেল। আর ভেতরে ঢুকতেই হয়ে গেল বন্ধ। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর। এতটুকু ধুলো, বা ভাসমান কণা যাতে না সেখানকার

পরিবেশে ছড়িয়ে থাকে তার জন্য সতর্ক ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভেতরে রিঅ্যাকটার। রিমোট কনট্রোলের সাহায্যে রিঅ্যাকটারটির কাজ নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

এই সাইরাস রিঅ্যাকটার নিয়েও পরে কথা বলেছিলাম ডঃ দস্তিদারের সঙ্গে।

'অপসরার নিউট্রনের শক্তিমাত্রা কম। আমরা বুঝতে পারলাম, উচ্চমান এবং উচ্চ সহনশীলতার পারমাণবিক চুল্লি তৈরি করতে গেলে নানা রকম ধাতুবিষয়ক পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন। বিভিন্ন গবেষণা এবং পেশায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের চাহিদা বাড়ছে। তার যোগান দিতে হবে। নিউট্রন এবং বিভাজন-পদার্থবিদ্যা বা ফিশন ফিজিকসের উচ্চতর গবেষণার প্রয়োজন। আর এ সব কাজের জন্যে দরকার আরও শক্তিশালী রিঅ্যাকটার। এ সব কথা ভেবেই সাইরাস রিঅ্যাকটার তৈরির কাজে আমরা হাত দিয়েছিলাম, যাতে করে নিউট্রনের প্রবাহমাত্রা এবং শক্তির পরিমাণ বেশি করে তোলা যায়।' বললেন ডঃ দস্তিদার।

এ কাজে সাহায্য করল কানাডা। এই রিঅ্যাকটারে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম। এই ইউরেনিয়ামের অর্ধেকটা দিল কানাডা। বাকি অর্ধেক ভারত। রিঅ্যাকটারটি তৈরিও করার দায়িত্ব ছিল কানাডার ওপর। ঠিক হয়, চালু হওয়ার পর ভবিষ্যতে যে ইউরেনিয়াম দরকার হবে সেটা ভারতই যোগাবে। এই রিঅ্যাকটারটির শক্তি ৪০ মেগাওয়াট। অপসরার শক্তির পরিমাণ ৪০০ কিলোওয়াট থেকে ১ মেগাওয়াট। সাইরাসকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে কাজে লাগানো হচ্ছে সাধারণ জল। আর তার নিউট্রন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ভারী জল বা হেভি ওয়াটার। উল্লেখ্য, ভারত অতি মূল্যবান এই বস্তুটির ব্যাপারেও স্বনির্ভর হতে চলেছে। হেভি ওয়াটার প্ল্যাণ্ট বসছে কোটায়, বরোদায়, তুতিকোরিন এবং তালচেরে।

'সাইরাস চালু হয় ১৯৬০-এর জুলাই-এ।' বললেন ডঃ দস্তিদার। তারপর দীর্ঘদিন সক্রিয় রয়েছে। এই রিঅ্যাকটারটির সাহায্যে এখানকার বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক পদার্থের ওপর ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছেন। ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি চুল্লি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন যাঁরা তাঁদের অনেকেই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এখানে। এ ছাড়া বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ উৎপাদন চলছে।

এ সব ছাড়াও জারলিনা নামক রিঅ্যাকটারের সাহায্যে চলছে পারমাণবিক প্রযুক্তির পদার্থের গঠন বৈচিত্র্য সম্পর্কে মৌলিক অনুসন্ধানের কাজ। পূর্ণিমা রিঅ্যাকটারের সাহায্যে প্লুটোনিয়াম অকসাইডের ব্যবহার প্রণালী রপ্ত করেছেন এখানকার বিজ্ঞানীরা। এই রিঅ্যাকটারটির কিছুটা হেরফের ঘটিয়ে এখন ইউরেনিয়াম-২৩৩ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে।

ডঃ দস্তিদার বললেন, এবার আমরা নতুন একটি রিঅ্যাকটার তৈরি করছি

সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায়। নাম আর—৫। এর শক্তি হবে ১০০ মেগাওয়াট। কাজ চলছে দেখলাম। সাইরাসের কাছেই এটি বসানো হচ্ছে।

হ্যাঁ, ধাপে ধাপে অনেক দূর এগিয়ে গেছে ভাবা পারমাণবিক গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা। নারোরায় বসছে নতুন পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র। এখানকার চুল্লি থেকে শুরু করে যাবতীয় সাজসরঞ্জাম যা কিছু দরকার তার শতকরা একশ' ভাগই তৈরি করবেন আমাদের বিজ্ঞানী এবং ইনজিনিয়াররা। কলপক্কমের কাজ এগিয়ে গেছে অনেকটা। আমাদের প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডার সীমিত হলেও, ক্ষতি নেই। অফুরন্ত থোরিয়াম আছে এ দেশে। সেই থোরিয়াম থেকে পারমাণবিক জ্বালানি ইউরেনিয়াম-২৩৩ তৈরি করার ক্ষমতা আমাদের বিজ্ঞানীদের করায়ত্ত। ইউরেনিয়াম-২৩৩কে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে পরীক্ষামূলক শক্তি উৎপাদক রিঅ্যাকটার তৈরির কাজ চলছে কলপক্কমে। তার থেকে ইলেকট্রনিকস থেকে শুরু করে যাবতীয় সাজসরঞ্জাম তৈরিও চলছে দেশের নানান সরকারী এবং বেসরকারী কারখানায়। এই গবেষণাগারেরই নেতৃত্বে।

ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ডঃ ভাবা একবার মন্তব্য করেছিলেন : ... When nuclear energy has been successfully applied for power production, in say a cauple of decades from now, India will not have to look abroad for its experts but will find them already at hand.'

ডঃ ভাবার এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হয়েছে। ভাবা গবেষণাগারের ওয়ার্কশপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গবেষণাগারই তার সাক্ষ্য।

তিন

'দ্য অপারেশন ইজ সাকসেসফুল, বাট দ্য পেসেণ্ট ইজ ডেড'। শল্য চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে এই প্রবাদটি এক কালে প্রায় সবার মুখে মুখেই ফিরত। নামী ডাক্তার। দক্ষ হাত। প্রচুর অভিজ্ঞতা। তবু অস্ত্রোপচারের পর দেখা গেল, রোগী মুমূর্ষু। চলল যমে মানুষে লড়াই। তারপর, সব শেষ।

খুব পুরনো দিনের কথা নয়। মাত্র বছর তিন চার আগে কলকাতার বড়সড় কোন এক হাসপাতালেই তো ঘটেছিল ঘটনাটা। সামান্য অস্ত্রোপচার। কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর রোগী আক্রান্ত হল টিটেনাসে। মারা গেল। ওই ঘটনার পর চিকিৎসকদের মধ্যে বড় রকমের চাঞ্চল্যও সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা ঠিক ভেবে পাচ্ছিলেন না, অপারেশন থিয়েটারে টিটেনাসের জীবাণু কি করে আসে? এর সম্ভাব্য উত্তর হয়ত তিনটি। এক, যে সব ছুরি, কাঁচি এবং সাজসরঞ্জাম অস্ত্রো—

পচারের সময় ব্যবহার করা হয়, হয়ত তাদেরই কারোর না কারোর গায়ে লেগেছিল প্রাণঘাতী সেই টিটেনাস রোগের জীবাণু। দুই, তুলো বা গজের মাধ্যমেও ওই রোগের জীবাণু পরিবাহিত হতে পারে। তিন, অস্ত্রোপচারের সময় ডাক্তাররা যে দস্তানা ব্যবহার করেছিলেন তাতেই রোগের জীবাণু লেগে ছিল না কে বলতে পারে ?

স্টেরিলাইজেশন। অর্থাৎ নির্জীবাণুকরণ। যে কোন চিকিৎসকের কাছেই এখন এটা বড় রকমের এক সমস্যা। এই সমস্যারই একটি অব্যর্থ সমাধান এনে দিয়েছে 'আইসোমেড'। বা ইরেডিয়েশন প্ল্যাণ্ট ফর স্টেরিলাইজেশন অভ্ মেডিকেল প্রোডাকটস। ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের এই প্ল্যাণ্ট চিকিৎসাসংক্রান্ত সামগ্রীর নির্জীবাণুকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাঁ পাশে সাইরাস পারমাণবিক চুল্লি। চুল্লির ডান দিকের আঁকাবাঁকা পথ ধরে মাইল খানেক দক্ষিণে এগিয়ে গেলেই চোখে পড়বে পুরু কংক্রিটের বাড়ি আইসোমেড। আইসোমেডের এক দিকে পাহাড়। আর এক দিকে আরব সাগরের খাঁড়ি। খাঁড়ির মাঝে অদূরে এলিফেণ্টা। সাধারণ মানুষও যাতে অনায়াসে এখানে যাতায়াত করতে পারে তার জন্যে এই প্ল্যাণ্টটিকে সিকিউরিটির কড়া চৌহদ্দির বাইরে বসান হয়েছে।

ঘরের মধ্যে ঘর। তার মধ্যে ঘর। ভেতরের ঘরের দেয়াল ছয় থেকে নয় ফুট পুরু কংক্রিটে তৈরি। যে কংক্রিটের মধ্যে রয়েছে সীসে। তেজষ্ক্রিয় গামা রশ্মির বিকিরণ যাতে ভেতরে আবদ্ধ থাকতে পারে, বাইরে গিয়ে মানুষ, পশুপাখি বা গাছপালার না ক্ষতি করতে পারে, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল পিজবোর্ডের তৈরি কয়েক ডজন প্যাকিং বাক্স। লম্বায় ৫৯ সেণ্টিমিটার, চওড়া ৩৪ সেণ্টিমিটার এবং ৪৩ সেণ্টিমিটার উচ্চতা। কনভেয়ার বেল্টের ওপর চড়ে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর পর কয়েকটি বাক্স গিয়ে ঢুকছে বিকিরণ কক্ষে। যার ওঁরা নাম দিয়েছেন গোলকধাঁধা। বাইরে থেকে এর ভেতরটা দেখা যায় না।

জনৈক অফিসার বললেন, এসব বাক্স আমাদের নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন মত প্যাক করা। পাঠিয়েছেন বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি। এদের মধ্যে আছে নানা রকম সামগ্রী। অস্ত্রোপচারের ছুরি, কাঁচি থেকে শুরু করে ইনজেকশন দেবার সিরিঞ্জ, তুলোর প্যাকেট, গজ প্রভৃতি। কোন কোন থলের মধ্যে আছে নানা রকম ওষুধের টিউব। যেমন চোখের মলম, এই সব।

ভদ্রলোক বললেন, ধরুন শরীরের কেটে যাওয়া কোন অংশ ড্রেস করতে হবে। এর জন্যে দরকার তুলো, গজ এবং ব্যাণ্ডেজের কাপড়। এসব একটি প্লাস্টিকের থলের মধ্যে পুরে থলেটির মুখ সিল করে দেয়া হয়। এ ধরনের

অনেক থলেই ওই বাক্সগুলির মধ্যে পাবেন। আবার কোন কোন থলের মধ্যে সিল করে রাখা আছে ভ্যাসেকটমি বা টিউবেকটমির সাজসরঞ্জাম। এমনভাবে সিল করা, যাতে বাইরের বাতাস না তাদের ভেতরে ঢুকতে পারে।

থলে ভর্তি বাক্সগুলি গোলকধাঁধার মধ্যে গিয়ে হাজির হবে তীব্র গামা রশ্মির সামনে। কারণ ওই গোলকধাঁধার মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে গামা রশ্মি বিকীর্ণ করে এমন ধরনের এক তেজষ্ক্রিয় রেডিও আইসোটোপ। গামা রশ্মির মাত্রা ২.৫ মেগারাডস। এই মাত্রার গামা রশ্মির সংস্পর্শে থলের মধ্যে রাখা বস্তুগুলির মধ্যে সামান্যতম রোগ জীবাণুও যদি থাকে তারা মারা পড়ে। এই ভাবেই করা হয় তাদের নির্জীবাণুকরণ।

প্রঃ আপাতত কি কি জিনিস আপনারা এই প্ল্যাণ্টে নির্জীবাণুকরণ করছেন?

উত্তর: ক্ষতস্থান সেলাই করার তন্তু, অস্ত্রোপচারকালীন ব্যবহারযোগ্য দস্তানা, মুখোশ, টাউয়েল, ছুরি, কাঁচি, দস্তানার পাউডার, প্লাস্টিকের ইনজেকশন সিরিঞ্জ, ঢাকা দেবার কাপড়, প্রোস্থেসিস, কথেটারস, প্রোবস, রক্ত দেবার এবং নেবার যন্ত্রপাতি, গজ, সুঁচ, কাঁচ বা প্লাস্টিকের নল, ভ্যাসেকটমি এবং টিউবেক-টমি কিটস, মেটারনিটি প্যাড, ওষুধপত্রের টিউব, অ্যাণ্টিবাইওটিক চূর্ণ, প্রভৃতি।

*

সমস্যাটা এই। ব্যক্তিগত চিকিৎসক থেকে শুরু করে বড় বড় হাসপাতাল বা গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখুন। একটি মাত্র ইনজেকশন দেবার সিরিঞ্জ। সেই একই সিরিঞ্জের সাহায্যে চিকিৎসক একাধিক রোগীর দেহে ইনজেকশন দিয়ে চলেছেন। প্রতিবার ইনজেকশন দেবার আগে সিরিঞ্জ এবং সুঁচ অবশ্য অ্যাল-কোহল বা অনুরূপ কোন বস্তুর সাহায্যে শোধন করে নেওয়া হয়। কিন্তু তাতে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। অনেক সময় অস্ত্রোপচারের সাজসরঞ্জাম জলে সেদ্ধ করে নির্জীবাণুকরণ করা হয়। এতেও ঝুঁকি থাকে যথেষ্ট। প্রথমত গরম জলের ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই করে ওঠা সম্ভব হয় না। হলেও ওই জলে নির্ভরযোগ্য এ কাজটি করা যায় না। দ্বিতীয়ত, কোন কোন সাজসরঞ্জাম বা ওষুধপত্র এই পদ্ধতিতে অনেক সময় শোধন করাও সম্ভব হয় না। এর ফলে বহুক্ষেত্রে ইনজেকশন দিতে গিয়ে অথবা অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে বিপদে পড়তে হয়।

'অথচ দেখুন', আইসোমেডের সেই ভদ্রলোক বললেন,—'বিকিরণ পদ্ধতিতে এ কাজটি সহজেই সারা যায়। পিজবোর্ডের বাক্স ভেদ করে গামা রশ্মি অনায়াসে প্লাস্টিকের থলের মধ্যে রাখা সামগ্রীর ওপর গিয়ে পড়ে। এবং সাধারণ তাপ-মাত্রাতেই তাদের ওপর জমে থাকা জীবাণুদের ধ্বংস করে।

'পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের কথাই ভাবুন। শহরের হাসপাতালে প্রচণ্ড

ভিড়। ভিড় গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও। বিকিরণের সাহায্যে নির্জীবাণুকৃত এক একটি কিট এই সব কেন্দ্রে কাজে লাগান যেতে পারে। এক এক জনকে ভ্যাসেকটমি বা টিউবেকটমি করতে যা যা দরকার প্রতিটি কিটের মধ্যে সেসবই পাওয়া যাবে। একজনকে অপারেশন করার পর সেগুলি ফেলে দিতে হবে।'

ভদ্রলোক একটি প্লাস্টিকের প্যাকেট তুলে ধরলেন আমার সামনে। বললেন, এই প্যাকেটের মধ্যে দেখুন তুলো এবং গজ রয়েছে। প্যাকেটটি সিল করা। ফলে বাইরে থেকে বাতাস ঢুকে যে জীবাণু দূষিত করবে তার উপায় নেই। গামা রশ্মির সাহায্যে এর ভেতরের সামগ্রী জীবাণুমুক্ত করা আছে। প্যাকেটটি যতদিন ইচ্ছে এই অবস্থায় রেখে দিন। ওই তুলো আর গজ জীবাণুমুক্ত থাকবে। কারোর হয়ত শরীরের কোন অংশ কেটে গেল। এবার প্যাকেট ছিঁড়ে গজ, তুলো এবং ব্যান্ডেজ ব্যবহার করুন। ঝক্কি নেই। অথচ, ভাবুন, হাসপাতালে খোলাভাবে যে তুলো বা ব্যান্ডেজ থাকে তাতে রোগসংক্রমণের আশঙ্কা থাকে কত বেশি।

প্রশ্ন ঃ আপনার কি মনে হয় না, এতে খরচ অনেক বেশি পড়বে ?

উত্তর ঃ কিছুটা বেশি পড়বে। তবে একটা কথা ভাবুন, ধরুন কারোর শরীরে গজ দিয়ে ব্যান্ডেজ করতে হল। আইসোমেডে শোধন করা সামগ্রী ব্যবহার করলে সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে অনেক কম। অথচ হাসপাতালগুলিতে যে ধরনের তুলো কাপড় দিয়ে ব্যান্ডেজ করা হয়, যে কোন মুহূর্তে এই আশঙ্কাটা কি এড়িয়ে যেতে পারেন ? আর সত্যিই যদি একবার ইনফেকশন ঘটে, ভাবুন আপনার খরচের বোঝা বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে বাড়ল ঝক্কি।

কথাটা ঠিক। আর একথা ভেবেই বহু প্রতিষ্ঠান এখন আইসোমেডের সাহায্য নিচ্ছে। বিকিরণের সাহায্যে শোধন করে নিচ্ছে নানা রকম সামগ্রী। কলকাতার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বাক্সও দেখলাম সেখানে।

প্রশ্ন করেছিলাম ডঃ রামান্নাকে ঃ আইসোমেডের প্রয়োজনীতা এখন অনস্বীকার্য। কিন্তু একটি আইসোমেড কি সারা দেশের চাহিদা মেটাতে পারে ?

ডঃ রামান্নার উত্তর ঃ কলকাতায় এ ধরনের একটি প্ল্যান্ট বসানর পরিকল্পনা আমরা করছি। এটা বসান হলে, পূর্ব ভারতই শুধু নয়, এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের অনেক দেশও তাতে লাভবান হবে।

সে প্ল্যান্ট কবে বসবে, জানি না। তবে এখানে কারোর কারোর সঙ্গে কথা বলে মনে হল, সেটা অনেকটা নির্ভর করছে এ অঞ্চলের চিকিৎসা বিষয়ক সাজসরঞ্জাম এবং ওষুধপত্রের যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদেরও ওপর। মনে হয়েছে, তাঁরা আগ্রহী হলে এ কাজ আরও ত্বরান্বিত হতে পারে।

*

মৌলিক পদার্থের সংক্ষিপ্ততম অবস্থাকে বলা হয় পরমাণু। একই মৌলিক

পদার্থের যে কোন পরমাণুর রাসায়নিক গুণাগুণ একই রকম হয়ে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন, রাসায়নিক গুণাগুণের দিক থেকে গরমিল না থাকলেও বেশ কিছু সংখ্যক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মধ্যে কিছুটা ভৌতিক স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। হলই বা তারা একই মৌলিক পদার্থের পরমাণু। উদাহরণ স্বরূপ লোহার কথাই ধরুন। বিশুদ্ধ লোহার মধ্যে একমাত্র লোহার পরমাণু থাকে ঠিকই। কিন্তু দেখা গেছে ওই সব পরমাণুর মধ্যে কারোর ওজন এক রকম কারোর অন্যরকম। ওজনের ভিত্তিতে হিসেব করলে দেখা যায় লোহার মধ্যে থাকে চার রকম পরমাণু। তাদের পারমাণবিক ভর যথাক্রমে ৫৪, ৫৬, ৫৭ এবং ৫৮। এবং তাদের হার যথাক্রমে শতকরা ৫.৮৪, ৯১.৬৮, ২.১৭ এবং ০.৩১। এদের বলা হয় লোহার আইসোটোপ। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউট্রন কণার সংখ্যা বেশি না কম, তার ওপরই নির্ভর করে কোন বস্তুর পরমাণুর আইসোটোপ। বলা বাহুল্য, নিউট্রনের সংখ্যার হেরফেরের জন্যেই একই মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক তার ভিন্নতর হয়ে থাকে।

কোন কোন আইসোটোপের নিউক্লিয়াস আবার স্থিতিশীল নয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের শক্তির ক্ষরণ হয়ে থাকে। এবং অবশেষে স্থিতিশীল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। পরমাণুর এই উদ্বৃত্ত শক্তি বেরিয়ে আসে কখনও আলফা কণা হিসেবে, কখনও বিটা কণা হিসেবে, আবার কখনও বা গামা বিকিরণ হিসেবে। আলফা কণা আসলে হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস। এর মধ্যে থাকে দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন। তার পারমাণবিক ভর ৪। এই সব কণা পজিটিভ আধান বহন করে। বিটা কণা আসলে ইলেকট্রন। বহন করে নেগেটিভ আধান। আর গামা এক ধরনের প্রচণ্ড তেজ সম্পন্ন বিকিরণ। একস-রশ্মির সঙ্গে তার তুলনা চলে একে। কোন বৈদ্যুতিক আধান থাকে না।

আরও একটি কথা। 'হাফলাইফ' বা অর্ধজীবন। তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপের কথা উঠলেই অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করেছেন এই শব্দটিও তার সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়। শব্দটির অর্থ কি?

ধরুন, এক তাল তেজষ্ক্রিয় ফসফরাস নিলেন। যার পারমাণবিক ভর ৩২। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, ওই এক তাল ফসফরাসের সমস্ত পরমাণুই তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ। কিছু সংখ্যক ফসফরাস পরমাণু তেজষ্ক্রিয়, কিছু সংখ্যক তেজষ্ক্রিয় নয়। দেখা গেছে ১৪ দিনের মধ্যে ওই তেজষ্ক্রিয় পরমাণুগুলির প্রায় অর্ধেক ক্ষরণের দরুন ভিন্নতর অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে, বাকি অর্ধেক অপরিবর্তিত আছে। এই ১৪ দিনকেই বলা হয় তেজষ্ক্রিয় ফসফরাস-৩২ এর হাফ লাইফ। অর্থাৎ হাফ লাইফ এমন একটি সময় যে সময়ে মোট তেজষ্ক্রিয় পরমাণুর অর্ধেক সংখ্যক পরমাণু শক্তি ক্ষরণের মাধ্যমে, তা সে আলফা কণার ভেতর দিয়েই হোক, অথবা বিটা কণার, কিংবা গামা বিকিরণ—পুরোপুরি

রূপান্তরিত হয়ে যায়। পরমাণু বিজ্ঞানীরা এই রূপান্তরকেই বলে থাকেন 'রেডিও অ্যাকটিক ডিকে'। উল্লেখ্য, 'হাফ লাইফের' সময়কাল এক-এক আইসোটোপের ক্ষেত্রে এক এক রকম। কারোর ক্ষেত্রে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। যেমন ফ্লুওরিন-১৮র হাফ লাইফ ১.৮ ঘণ্টা। আবার কার্বন-১৪র হাফ লাইফ কয়েক হাজার বছর।

প্রকৃতিতে মোটামুটি পঞ্চাশটি মৌলিক পদার্থের আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের বেশির ভাগই ভারি পদার্থ। যেমন বিসমাথ, থোরিয়াম, সীসে, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি। তবে পারমাণবিক চুল্লি এবং সাইক্লোট্রনের মত পারমাণবিক ত্বারিক যন্ত্রের কৃত্রিম পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত প্রচুর সংখ্যক তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের ওপর যথেষ্ট তেজ সম্পন্ন প্রোটন, আলফা বা নিউট্রন কণার আঘাত হেনে, কিংবা গামা রশ্মির আঘাতে এই সব আইসোটোপ তৈরি করা হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপের চাহিদা বাড়ছে। বাড়ছে কৃষি-বিজ্ঞানের গবেষণায়, রোগ চিকিৎসায়, ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজে। আই-সোমেডের জন্যেও তো আইসোটোপ চাই। আইসোটোপের ব্যবহার এখন আরও কত কাজেই না বেড়েছে। শুধু বিশেষ কয়েকটি আইসোটোপ নয়, নানারকম আইসোটোপ দেশে পারমাণবিক প্রকল্প নেবার আগে অতি মূল্যবান, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিহার্য এসব বস্তুর জন্যে আমাদের পুরোপুরি নির্ভর করতে হত বিদেশের ওপর। তার জন্যে খরচা হত প্রচুর। একচেটে কারবার করতে গিয়ে বিদেশী কোম্পানিরা দরদস্তুর যেমন করত, টালবাহানাও ছিল তাদের অনেক। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে যেন দাক্ষিণ্য দেখাচ্ছে।

কিন্তু পটের পরিবর্তন হয়েছে। ভাবা পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্রের চেষ্টায় আইসোটোপ উৎপাদনের ব্যাপারে আমাদের দেশ এখন আত্মনির্ভর। বিশেষ ধরনের গুটিকয় আইসোটোপ ছাড়া। ভারতই এখন আইসোটোপ রপ্তানি করছে বিদেশে।

এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছিলাম ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের বিশিষ্ট আইসোটোপ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভি কে আইয়ার সঙ্গে। অত্যন্ত আশাবাদী ডঃ আইয়া। কথা বলছিলাম তাঁর গবেষণাগারে বসে।

বললেন, বিশ্বাস করুন, মিঃ কর, মানব কল্যাণে কতটুকু কাজে লাগাতে পেরেছি আমরা এই রেডিও আইসোটোপ ? আইসোটোপ উৎপাদনের ব্যাপারে আমরা আত্মনির্ভর। এর ভূমিকা কোথায় নেই ? বিশেষ করে চিকিৎসা এবং ওষুধ শিল্পে আইসোটোপের ভূমিকা এখন কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত এগিয়ে আসা। তাতে করে শুধু যে মানুষেরই উপকার হবে তা নয়, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাঁরাও লাভবান হবেন।

তাঁরা আমাদের সঙ্গে দয়া করে যোগাযোগ করুন, প্রকৌশলগত অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরাই সাহায্য করব তাঁদের।

বুঝলাম, আইসোটোপের জগতেই মনেপ্রাণে ডুবে রয়েছেন ডঃ আইয়া। তাঁর স্বপ্ন, দেশে বিজ্ঞানের এই বিশেষ ফলটি মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাক। এ ব্যাপারে ডঃ আইয়ার সঙ্গে আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছি। সে আলোচনা টেপ রেকর্ড করে নিয়েও এসেছিলাম। পরবর্তী অধ্যায়ে তার উল্লেখ করব। আপাতত আইসোটোপ উৎপাদন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল এখানে উল্লেখ করলাম।

প্র ঃ ডঃ আইয়া, শুনেছি দেশের চাহিদা মিটিয়ে ভারত এখন বিদেশের বেশ কয়েকটি দেশে আইসোটোপ রপ্তানি করছে। কোন কোন দেশে রপ্তানি করছে? তাতে কতটা আর্থিক সাশ্রয় ঘটেছে আমাদের?

ডঃ আইয়া ঃ যে সব দেশে আইসোটোপ রপ্তানি করছি তাদের মধ্যে আছে অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, আবু-ধাবি, আরজেনটিনা, আফগানিস্থান, বলিভিয়া, বার্মা, ব্রাজিল, বাংলাদেশ শ্রীলংকা, কলোম্বিয়া, ডেনমার্ক, ইথিওপিয়া, ফ্রান্স, ঘানা, গ্রীস, হংকং, হাঙ্গেরি, হল্যাণ্ড, ইটালি, ইনদোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, কুয়াইত, কেনিয়া, লেবানন, মরোক্কো, মেকসিকো, মালেশিয়া, নেপাল, নাইজেরিয়া, ফিলিপিনস, পোল্যাণ্ড, পেরু রোমানিয়া, সুইডেন, সিঙ্গাপুর, সেনেগাল, সিরিয়ান আরব রিপাবলিক, সুদান, স্পেন, থাইল্যাণ্ড, তাইওয়ান, তুরস্ক, তানজানিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক, উগাণ্ডা, উরুগুয়ে, ভিয়েতনাম এবং পশ্চিম জার্মানি। আমাদের আয় হয়েছে ২৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।

প্র ঃ ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে কি কি তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ আপনারা তৈরি করছেন?

ডঃ আইয়া ঃ তিন রকম আইসোটোপ এখানে আমরা তৈরি করে থাকি। এক, চিকিৎসা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণায় লাগে এমন শ্রেণীর আইসোটোপ। যেমন, আইওডিন-১১, ফসফরাস-৩২, ক্রোমিয়াম-৫৯, ব্রোমিন-৮২, সোডিয়াম-২৪, সালফার-৩৫ পটাশিয়াম-৪২, ক্যালসিয়াম-৪৫, আইরন-৫৯, রুবিডিয়াম-৮৬, টেকনেসিয়াম-৯৯ এম, গোল্ড-১৯৮, প্রভৃতি এ ধরনের মোট ৪৫ রকম আইসোটোপ এখানে আমরা তৈরি করছি। দুই, বিভিন্ন শিল্পে কাজে লাগে এমন ধরনের আইসোটোপ। যেমন ইরিডিয়াম-১৯২, কোবলট-৬০, থেলিয়াম-২০৪। তিন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে কার্বন-১৪। ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র থেকে এখন মোট ৩৫০ রকমের আইসোটোপ পাওয়া যেতে পারে।

প্র ঃ এ সব আইসোটোপ তৈরির কাঁচা মাল কি ভারতেই পাওয়া যায়? না বিদেশ থেকেও কিছু কিছু আমদানি করতে হয়?

ডঃ আইয়া ঃ বেশির ভাগই ভারতে পাওয়া যায়। যৎসামান্য আনতে হয় বিদেশ থেকে।

প্রঃ এখানকার কোন কোন পারমাণবিক চুল্লি কি কি আইসোটোপ তৈরি করে সে সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

ডঃ আইয়া ঃ 'অপসরা'তে তৈরি হয় ফসফরাস-৩২, গোল্ড-১৯৮, কোবলট-৫৮, প্রভৃতি। এদের বেশীর ভাগই ক্ষণজীবী আইসোটোপ। তবে বেশির ভাগ আইসোটোপের জন্যে আমাদের নির্ভর করতে হয় 'সাইরাসে'র ওপর।

প্র ঃ গবেষণা ক্ষেত্রে আইসোটোপের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলুন।

ডঃ আইয়া ঃ যেমন ধরুন ফসফরাস-৩২। সুপার-ফসফেট সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে ভারতের সমস্ত গবেষণাগারে এই আইসোপটি আমরা সরবরাহ করে থাকি। কৃষি গবেষণাগারে আমরা পাঠাই পটাশিয়াম-৪২, সালফার-৩৫, প্রভৃতি। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ধাতব পাতের গুরুত্ব মাপার জন্যে এখান থেকে সংগ্রহ করে থেলিয়াম-২০৪। বাতাসে ধোঁয়ার অবস্থিতি জেনে কোথাও আগুন লাগল কি না, সেটা জানতে সাহায্য করে আমেরিসিয়াম-২৪১। ক্যানসার চিকিৎসার জন্যে দরকার কোবলট-৬০। ঝালাই-এর মধ্যে সূক্ষ্ম ত্রুটি রইল কি না, সেটা জানতে সাহায্য করে ইরিডিয়াম-১৯২।

প্র ঃ ডঃ আইয়া, কলকাতার সাইক্লোট্রনও তো নানা রকম আইসোটোপ তৈরি করবে শুনেছি। এ সম্পর্কে আপনি কি কিছু বলবেন ?

ডঃ আইয়া ঃ ভাল প্রশ্ন। দেখুন, সাইক্লোট্রনের সাহায্যে এমন কিছু কিছু আইসোটোপ তৈরি করা যায়, যাদের পারমাণবিক চুল্লিতে তৈরি করা সম্ভব নয়। এই সব আইসোটোপের অনেকের হাফ লাইফ এত কম যে, তাদের সাহায্যে যদি কোন মূল্যবান গবেষণা চালাতে হয়, তা হলে সে সব গবেষণার সুযোগ কলকাতাতেই করতে হবে। যেমন ধরুন, ওই সাইক্লোট্রন তৈরি করতে পারবে তেজষ্ক্রিয় ফ্লুওরিন-১৮। যার হাফ লাইফ মাত্র ১.৮ ঘণ্টা। অগ্ন্যাশয়, দাঁত, শরীরের হাড়, রক্ত প্রবাহ—এ সবের ওপর তথ্যাদি জানা যেতে পারে এই আইসোটোপটির সাহায্যে। এটিকে নিশ্চয় আপনি বোম্বাই-এ নিয়ে আসতে পারবেন না। ১.৮ ঘণ্টার মধ্যেই তারা 'ডিকে' হয়ে যাবে। অতএব ওই সব তথ্য এর সাহায্যে কলকাতায় বসেই করতে হবে। আইরন-৫২ আর এর একটি ক্ষণস্থায়ী আইসোটোপ। এর হাফ লাইফ মাত্র ৮.২ ঘণ্টা। সাইক্লোট্রনে তৈরি হয়, চুল্লিতে নয়। অস্থি-মজ্জার রোগ নির্ণয়ে এই বস্তুটি সাহায্য করে। যদি অদূর ভবিষ্যতে কলকাতায় চিকিৎসা এবং চিকিৎসা-শিল্পের ভাল ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, পূর্বাঞ্চলে অনেকেই লাভবান হবেন বলেই আমার বিশ্বাস। এ লাভ উন্নত ধরনের চিকিৎসা এবং অর্থনৈতিক—দুই দিক দিয়েই হবে।

ডঃ আইয়ার সঙ্গে কথা বলে মনে হল, বিজ্ঞানের আধুনিকতম সুযোগ

যেমন চাই, সেই সঙ্গে দরকার সর্বসাধারণের মনে যথাযথ প্রবণতার উপস্থিতি। যে প্রবণতা সেই বিজ্ঞানকে বুঝে নিতে সাহায্য করে, সাহায্য করে নিজেদের কল্যাণে প্রয়োগ করার ব্যাপার।

চার

'এনার্জি' ইজ অল রাইট। নাও উই আর গোয়িং টু ফ্লাড দ্য কানট্রি বাই অয়েল অ্যাণ্ড সুগার। হ্যাভ ইউ সিন আওয়ার এগ্রিকালচারাল ল্যাব? দ্য গ্রাউণ্ড নাট, অ্যান্ড দ্য সুগার কেন?' বোম্বাই-এর ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ মার্গে ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনা করলাম আমাদের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ এইচ এন শেঠনার সঙ্গে। এটা ছিল আমাদের একান্ত সাক্ষাৎকার। ট্রম্বের বিজ্ঞানীরা নতুন জাতের যে চিনেবাদাম এবং আখ তৈরি করেছেন, দেখলাম, ডঃ শেঠনা সে ব্যাপারে প্রচণ্ড উৎসাহিত এবং উচ্ছ্বসিতও।

ডঃ শেঠনা বললেন, আমাদের বিজ্ঞানীরা বিকিরণকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছেন নতুন জাতের চিনেবাদাম। যার তেলের পরিমাণ সাধারণ চিনেবাদামের চেয়ে অনেক বেশি। এক ধরনের সংকরজাতীয় আখও তৈরি করেছেন। যাতে চিনির পরিমাণ সাধারণ আখের চেয়ে শতকরা তিরিশ ভাগ বেশি। চাষীরা যদি এগিয়ে আসেন, আমার বিশ্বাস এই বাদাম এবং আখ চাষ করে তারাই যে শুধু লাভবান হবেন তা নয়, দেশ খাওয়ার তেল এবং চিনির ব্যাপারে যথেষ্ট আত্ম-নির্ভর হতে পারবে।

দেখেছি। সেই চিনে বাদাম এবং আখ নিজের চোখে দেখে এলাম। দেখা-লেন গবেষণা কেন্দ্রের কৃষি বিভাগের বিজ্ঞানী ডঃ এন এস রাও।

ডঃ রাও বিজ্ঞানী হিসাবে দীর্ঘকাল চুচুড়া এবং ব্যারাকপুরে ছিলেন। পরিচয়ের পর বললেন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি সম্পর্কে অনেক তথ্য আমি জানি। ভালই হল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে।

বাদামের কথা তুলতেই ডঃ রাও-ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ, অদ্ভুত ব্যাপার বটে। আপনিও দেখে চমকে উঠবেন। বলেই সংরক্ষিত প্যাকেট থেকে কয়েকটি বাদাম আমার সামনে মেলে ধরলেন।

প্রথম দর্শনে আমিও চমকে উঠেছিলাম। এত বড় বাদাম! কয়েকটি নমুনা আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। পরে স্কেল দিয়ে মেপে দেখেছি, খোসাশুদ্ধ এই বাদাম লম্বায় সাড়ে পাঁচ সেণ্টিমিটার। আর তার দানাগুলি লম্বায় প্রায় আড়াই সেণ্টিমিটারের মত। উল্লেখ্য, বাজারে যে চিনেবাদাম পাওয়া যায় তারা খোসাশুদ্ধ লম্বা হয় গড়ে আড়াই থেকে তিন সেণ্টিমিটার। তাদের দানার গড় দৈর্ঘ্য এক সেণ্টিমিটারের কিছু বেশি।

ডঃ রাও বললেন, এই বাদামের উৎপাদন হেকটর প্রতি সাধারণ বাদামের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। চাষ করার কোন অসুবিধে নেই। খরচও যে খুব বেশি পড়ে তাও বলব না। উৎসাহী চাষীদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে আমরা সাহায্যও করছি। গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে প্রচুর ফলন হয়েছে এই বাদামের।

প্র ঃ আপনি কি মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেও এই বাদাম চাষ করা সম্ভব ?

ডঃ রাও ঃ অবশ্যই। আমার তো মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের চাষীরা তাতে লাভবানই হবেন।

প্র ঃ দেখুন ডঃ রাও, মিউটেশন ঘটিয়ে বড় বড় দানাওয়ালা বাদাম আপনারা তৈরি করেছেন, খুব ভাল কথা। এই বাদামে তেলের পরিমাণ বেশি, এটাও একটা বড় রকমের লাভ। খাদ্য হিসেবেও কি আপনি মনে করেন এই বাদাম সাধারণ চিনেবাদামের চেয়ে উৎকর্ষে কোন অংশে কম নয় ? স্বাদ, গন্ধ এবং খাদ্য-মূল্য—এ সব কথা ভেবেই আমি এই প্রশ্নটি করছি, ডঃ রাও।

ডঃ রাও ঃ বুঝেছি, আপনি কি জানতে চান। না। এ সব ব্যাপারে কোন অসুবিধের কারণ নেই।

ভাবা পরমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের কৃষি বিভাগ নতুন জাতের বাদাম ছাড়াও তৈরি করেছেন কয়েক জাতের আখ। উৎপাদন এদেরও বেশি। আখগুলি বাঁশের মত মোটা। কিন্তু মোটেই জলো নয়। বরং সাধারণ আখের চেয়ে এদের চিনির পরিমাণ বেশি। এ ছাড়া প্রজননগত পরিবর্তন ঘটিয়ে এখানকার গবেষকরা তৈরি করেছেন নতুন জাতের মুগ, অড়হর, প্রভৃতি ডাল এবং সরষে। অড়হর ডালের দানা দেখলাম সাধারণ অড়হর ডালের দানার চেয়ে বড়। সরষের দানাও বেশ বড়। ডঃ রাও বললেন, এদেরও তেলের পরিমাণ বেশি।

কৃষি-শস্য ছাড়াও এখানে কাজ চলছে নানা দিক নিয়ে। পোকামাকড়ের হাত থেকে শস্য সংরক্ষণের জন্যে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন রসুনের তেলের গুণাগুণের ওপর। তাঁরা দেখেছেন, সংরক্ষিত শস্যে যৎসামান্য রসুনের তেল দিলে তাতে আর পোকামাকড় লাগে না। মশা ধ্বংসের জন্যে এক ধরনের ছোট ছোট মাছ নিয়ে তাঁরা পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছেন। নাম 'মসকিউটো ফিস' বা মশা মাছ। এরা নোংরা জলে বাস করতে পারে। এদের সামনে মশার বাচ্চা পড়লে আর রেহাই নেই। খেয়ে সাবাড় করে দেয়।

ডঃ রাও বললেন, শহরে নালা নর্দমায় এদের ছেড়ে দেওয়া যায়। দেখবেন মশার ডিম থেকে শুরু করে তাদের পিউপা, লার্ভা সব সাফ হয়ে গেছে। বাতাসের নাইট্রোজেনকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে নাইট্রোজেন সারের ঘাটতি মেটান যায়, উদ্ভিদে ফসফেট সারের বিপাকীয় ভূমিকা, কীটনাশক ওষুধের নিয়ন্ত্রণ এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা চলছে এই গবেষণা কেন্দ্রে।

মন্তব্য করেছিলাম ঃ আমাদের তো কৃষি গবেষণার জন্যে পৃথক সংস্থা আছে। ইনডিয়ান কাউনসিল ফর এগ্রিকালচারাল রিসার্চ। এদের অধীনে রয়েছে কয়েক ডজন গবেষণা কেন্দ্র। রয়েছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এ ছাড়া দেশে প্রচুর বিশ্ব-বিদ্যালয়েও কৃষি সংক্রান্ত নানান সমস্যা নিয়ে গবেষণা চলছে। তা যদি হয়, তাহলে ভাবা পারমাণবিক কেন্দ্রে তার পুনরাবৃত্তি কেন?

মন্তব্যটি শুনে ডঃ রাও যেন কিছুটা গম্ভীর হলেন। তারপর বললেন, এ কথা কেউ কেউ বলেন অবশ্য। তবে এর উত্তরে আমরা একটি কথাই বলব। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন সুগম করার জন্যে তৈরি হয়েছিল এই গবেষণাগার। আমরা দেখলাম, এ কাজটি গড়ে তুলতে গিয়ে আরও নানা রকম সুযোগ এখানে তৈরি হচ্ছে। তৈরি হয়েছে নানা রকম রেডিও-আইসোটোপ, তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ ব্যবস্থা। এই সব সুযোগের সাহায্যে অনেক সমস্যার যে সমাধান করা চলে, অনেক সম্ভাবনাকে যে উজ্জ্বল করা যায়, এ তো সবাই জানেন। যেমন ধরুন, আমরা জানি, তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ অনেক সময় প্রাণী এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। কিন্তু দেখুন, আমাদের দেশে বেশ কিছু অঞ্চলের মাটিতে প্রচুর মনোজাইট আছে। এই মনোজাইটে থাকে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ। যেমন থোরিয়াম। অথচ আমরা দেখছি, ওই সব মাটিতে নানা রকম গাছপালা বহাল তবিয়তে টিঁকে আছে। কিভাবে, সেটা উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের কাছে একটা বড়ো রকমের রহস্য। এ সব নিয়ে গবেষণা করতে গেলে শুধু উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হলেই চলে না, দরকার পদার্থবিজ্ঞানী, তেজষ্ক্রিয় রাসায়নিক প্রভৃতির সাহায্য। দরকার নানা রকম ইলেক্ট্রনিক সাজসরঞ্জাম। এ সব সুযোগ স্বাভাবিকভাবেই এখানে গড়ে উঠেছে। তাদের অনায়াসে আমরা কাজে লাগাচ্ছি। তবে হ্যাঁ, সব আমরাই করছি বললে ভুল হবে। কৃষি গবেষণাগারগুলি থেকে শুরু করে অন্যান্য গবেষণাগারগুলির সঙ্গেও আমাদের যোগ রয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতায় দেশের বহু গবেষণাগারে গড়ে উঠেছে বিকিরণের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা।

*

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন ভাবা পারমাণিক গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। সেটা খাদ্যশস্য সংরক্ষণ। তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে।

'পদ্ধতিটি খুবই সাধারণ' বললেন এই গবেষণা কেন্দ্রের বাইও-কেমিস্ট্রি এবং ফুড টেকনলজি বিভাগের প্রধান ডঃ বি জি নাদকারনি। 'ধরুন, আলু, পেঁয়াজ, ডাল প্রভৃতি। গত কয়েক বছরে এ সব ফসলের উৎপাদন বেড়েছে অনেক। কিন্তু যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে তাদের অপচয়ও সেই সঙ্গে বেড়েছে। ট্রেনে অথবা ট্রাকে বস্তাবন্দী করে পেঁয়াজ পাঠালেন। পথে আসতে আসতে কয়েক

দিনের মধ্যেই দেখা গেল পেঁয়াজগুলির গাছ বেরিয়ে গেছে। উপযুক্ত হিমঘরের অভাবে বছরে হাজার হাজার টন আলু নানা রকমের জীবাণুর আক্রমণে পচে যায়। এ ধরনের অপচয় রোধ করার জন্যে আমরা তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ কাজে লাগাতে পারি। আমরা দেখেছি, নিয়ন্ত্রিত মাত্রার গামা বিকিরণের সাহায্যে শোধন করে নিলে এ সব শস্য অনেক দিন ধরে পচনের হাত থেকে বাঁচান যায়।'

বিরাট গবেষাণাগার। পুরোপুরি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। কোন ঘরে চলছে বিভিন্ন তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে বিকীর্ণ রশ্মির সাহায্যে জীবাণু বিষয়ক গবেষণা! কোন ঘরে খাদ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ডঃ নাদকারনির সঙ্গে গেলাম সংরক্ষিত খাদ্যসামগ্রী দেখতে একটি ঘরে।

পর পর এক জোড়া করে পাত্র সাজান। পাত্রে পাশাপাশি রাখা হয়েছে বিকীর্ণ এবং অবিকীর্ণ ফসলের নমুনা। আলু, পেঁয়াজ, ডাল, ধান, গম, কলা প্রভৃতি। যাদের ওপর গামা বিকিরণ ফেলা হয়েছে দেখলাম তাদের চেহারা যথেষ্ট টাটকা। আর অবিকীর্ণ নমুনাগুলি প্রায় নষ্ট হওয়ার মুখে। জীবাণুর আক্রমণে আলুর গায়ে পড়েছে ছোপ। খোসা কুঁচকে গেছে। অংকুরিত হয়েছে। পেঁয়াজেরও ওই একই অবস্থা। ডালগুলি বিবর্ণ।

ডঃ নাদকারনি বললেন, শুধু সব্জিই নয়। এদিকে আসুন। দেখুন, নিয়ন্ত্রিত গামা বিকিরণের সাহায্যে মাছ মাংসও কেমন টাটকা অবস্থায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

না। বরফের ব্যবস্থা নেই। হিম ঘরের মতও কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। খোলা ঘরে কয়েকটি ট্রে পাশাপাশি। তাদের ওপর রেখে দেওয়া হয়েছে চিংড়ি এবং মাংস। গামা বিকিরণে শোধন করার পর। কয়েক দিন ওই ভাবেই আছে তারা। অথচ কোন বিকৃতির লক্ষণ নেই।

ডঃ নাদকারনি বললেন, দেখুন, অনিবার্য কারণে সারা দেশের খাদ্যশস্য সংরক্ষণের পুরোপুরি ব্যবস্থা এখনও আমরা করে উঠতে পারিনি। হিমঘর আছে অনেক। তবে প্রয়োজনের তুলনায় কম। সমুদ্র, নদী, খাল বিলে প্রচুর মাছ ধরা হয়। বরফের অভাবে সে সব মাছ ঠিক মত সংরক্ষিত করা সম্ভব হয় না। তাদের পচিয়ে নষ্ট করা হয়। হিমঘরের জন্যে চাই বিদ্যুৎ শক্তি। ইদানীং তারও ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কলার কথাই ধরুন, অথবা আম। গাছ থেকে পেড়ে এদের হয়ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান দিতে গেলেন। অথবা বিদেশে রপ্তানি। দেখা গেল গন্তব্যস্থলে পেঁছানর আগেই মাঝপথে তারা পেকে গেল। চালানের একটা বড় রকমের অংশ নষ্ট হয়ে গেল এইভাবে। এতে যে শুধু আর্থিক ক্ষতি হয় তা নয়, মূল্যবান খাদ্যেরও তো অপচয় ঘটে? অথচ গামা বিকিরণের সাহায্য নিন। দেখবেন, সাধারণ তাপমাত্রায় রেখে দেওয়া সত্ত্বেও আলু, পেঁয়াজ, শাকসব্জি, ডাল নষ্ট হবে না,

পচবে না। তাদের গাছও গজাবে না। ফলমূলের পাকার সময়টাও বিলম্বিত করা যায় এই বিকিরণের সাহায্যে।

প্র ঃ গামা বিকিরণের ফলে ওই সব বস্তুর খাদ্যগুণ নষ্ট হবে না তো ?

উত্তর ঃ আলু, পেঁয়াজ, আম, কলা, চিংড়ি মাছ প্রভৃতির ওপর যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে আমরা গবেষণা চালিয়েছি। পৃথিবীর আরও কয়েকটি দেশেও এ নিয়ে কাজ হয়েছে। বিকীর্ণ খাবার বিভিন্ন পশুকে খাইয়ে পরীক্ষাও করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, এ ব্যাপারে চিন্তা করার কোন কারণ নেই। অনেকের ভয়, বাবা, তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ! ও সব খাবার খেলেই হয়ত তেজষ্ক্রিয়তায় ভুগতে হবে। রোগ হতে পারে। এ সব ধারণা ভুল এভাবে সংরক্ষণ করলে খাবারের কোন ক্ষতি হয় না।

ডঃ নাদকারনি বললেন, একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। চিল্কায় মাছ ধরা পড়ে প্রচুর। কিন্তু বরফের অভাবে সেই মাছের বেশ কিছু পরিমাণ কলকাতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। নিয়ে গেলেও সব মাছ তো আর সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী হবে না। মার্কেটিং-এর জন্যে তাদের রেখে দিতে হয় আরও কয়েক দিন। আর এ সব করতে গিয়ে প্রচুর মাছ পচে নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এ সমস্যাটি সহজেই মেটান যায়। যাঁরা মাছের কারবারী, তাঁরা একটি বিকিরণ-প্ল্যাণ্ট বসান। ফ্রেশ মাছ তুলে তাদের বিকীর্ণ করে নিন। তারপর চালান দিন। বরফের হাঙ্গামা নেই। খোলা জায়গায় রেখে দিন। দেখবেন, বেশ কয়েক দিন মাছগুলি টাটকাই রইল।

ডঃ নাদকারনির কথা শুনে মনে হল, এ দিকটা ভেবে দেখা দরকার। যতই আমরা বিরূপ সমালোচনা করি না কেন, গত কয়েক বছরে এ দেশে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু উন্নতি হয়েছে অনেক। তার অনেক খবর আমরা রাখি না। রাখলেও, তাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজে লাগানর ব্যাপারে যতটা উৎসাহ দরকার, যতটা ভূমিকায় প্রয়োজন আমাদের তরফ থেকে অনেক সময় সেটা দেখা যায় না। আর দেখা যায় না বলেই প্রচুর উদ্ভাবনা শুধু বাক্স বন্দী হয়েই থেকে যায়। আমার মনে হয়েছে, খাদ্য সংরক্ষণের জন্যে হিমঘর প্রভৃতির কথা যাঁরা ভাবছেন, গুদামে চাল-গম রেখে যাঁরা নিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তেজষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণের ব্যাপারটা তাঁরা একটু ভেবে দেখুন না। যাবতীয় তথ্য ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই জানতে পারবেন তাঁরা। জানতে পারবেন এই পদ্ধতির কলা-কৌশল, কত খরচ পড়ে তার হিসেব, সুবিধে অসুবিধে সম্পর্কিত তথ্যাবলী। এ ধরনের প্ল্যাণ্ট তৈরির প্রযুক্তিগত সাহায্যও সেখান থেকে পাওয়া যেতে পারে।

*

প্রশ্নটি চিকিৎসা বিষয়ক সমস্যার ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

গিয়েছিলাম বোম্বাই-এর টাটা মেমোরিয়াল হসপিটালে অবস্থিত ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের রেডিয়েশন মেডিসিন সেণ্টারে। সেণ্টারের প্রধান ডঃ আর ডি গনত্রের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, কলকাতায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব মেডিসিনেও তেজষ্ক্রিয় চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। খুব ভাল কাজ করছেন সেখানকার কয়েকজন চিকিৎসক-বিজ্ঞানী। আমাদের আশা, এখানকার মত সেখানেও একটা উপযুক্ত রেডিয়েশন মেডিসিন সেণ্টার গড়ে উঠুক। ওঠা দরকার। কারণ কলকাতার সাইক্লোট্রন অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করবে, যা চিকিৎসায় সাহায্য করবে।

দীর্ঘ আলোচনা করেছি ডঃ গনত্রের সঙ্গে। সেই সঙ্গে ঘুরে দেখেছি টাটা মেমোরিয়াল হসপিটালের তেজষ্ক্রিয় চিকিৎসা বিভাগ। বড় বড় রেডিও স্ক্যানার বসিয়েছেন তাঁরা। আনুষঙ্গিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। বোম্বাই অঞ্চলের বেশির ভাগ হাসপাতালের সঙ্গে যোগ রেখে এখানে চলছে নানা রোগের চিকিৎসা, চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা। যন্ত্রপাতির অনেকই ভারতে তৈরি।

ডঃ গনত্র বললেন, জানেন, অনেকে মনে করেন, রেডিয়েশন মানেই ক্যানসার। একমাত্র ক্যানসার চিকিৎসাতেই বুঝি তেজষ্ক্রিয়তার আশ্রয় নেওয়া হয়। কিন্তু তাই কি? ওটা একটা মাত্র দিক। রেডিয়েশন মেডিসিনকে আমরা দুইভাবে কাজে লাগাতে পারি। এক, রোগ নির্ণয়। দুই, রোগ নিরাময়।

প্র ঃ ক্যানসারের কথা আমরা জানি। ক্যানসার নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা বাইওপসি করা। অর্থাৎ ক্যানসারদুষ্ট দেহ-কোষ শরীর থেকে সংগ্রহ করে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করা। ইদানীং এর বদলে যাঁর শরীরে ক্যানসার হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, তাকে বিশেষ আইসোটোপ ঘটিত কোন ওষুধ দেওয়া হয়। ওই আইসোটোপ শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এবং যেখানে যেখানে পড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ। এই বিকিরণের চরিত্র দেখে আপনারা সিদ্ধান্ত করেন সত্যিই তাঁর ক্যানসার হয়েছে, কি না। কিন্তু ধরুন, কেউ সংক্রামক রোগে ভুগছে, কারো বা ডায়াবেটিজ অথবা কেউ রক্তাল্পতার শিকার—এসব রোগও কি তেজষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়?

ডঃ গনত্র ঃ অবশ্যই যায়। বরং বলব, নির্ণয় করার ব্যাপারে সময় লাগে কম। নির্ণয়ের কাজটাও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। রক্ত পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করতে অনেক সময় তিন চার দিন লেগে যায়। তেজষ্ক্রিয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে এ কাজ কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সারা সম্ভব। কুষ্ঠ, টি-বি, বহুমূত্র রোগ, ভিটামিন ঘটিত রোগ থেকে নানা রকম সংক্রামক রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে এখানে। এসব রোগ নির্ণয়ের জন্যে রোগীকেও এখানে আসতে হবে না। ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকে রোগীর প্রস্রাব, রক্ত প্রভৃতি পাঠিয়ে দিন।

আমাদের বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বলে দেবেন, রোগটা কি। খরচও খুব বেশি পড়ে না। বিশেষ ক্ষেত্রে রোগীর কাছ থেকে আমরা কোন পয়সা নিই না।

ভারতের আধুনিকতম এই তেজষ্ক্রিয় চিকিৎসা বিভাগে নানা রকম রোগীর ভিড় লেগেই আছে। কেউ ব্রেন ক্যানসারে ভুগছেন, কেউ থাইরয়েড অথবা কিডনির ক্যানসারে। আবার বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘস্থায়ী রোগ নিয়েও হাজির হয়েছেন অনেকে।

চিকিৎসা ছাড়াও এই কেন্দ্র তেজষ্ক্রিয় চিকিৎসার ব্যাপারে প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ডাক্তাররা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। কলকাতার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব মেডিসিনের কয়েকজন ডাক্তারও নিয়ে এসেছেন এখানকার অভিজ্ঞতা।

ডঃ গনত্র বললেন, আমাদের এই সেণ্টার এখন দুটি ডিপ্লোমা কোর্স চালিয়ে যাচ্ছে। একটি ডিপ্লোমা ইন রেডিয়েশন মেডিসিন। এক বছরের কোর্স। মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটদের জন্যে। অপরটি ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল রেডিও আইসোটাপ টেকনিক। বিজ্ঞানে যাঁরা স্নাতক তাঁদের জন্যে এই কোর্সটি খোলা হয়েছে। দেশে রেডিয়েশন মেডিসিনের প্রসার ঘটেছে। এসব প্রশিক্ষণ কর্ম সংস্থানও যোগাবে। বলা বাহুল্য, মানব কল্যাণে পরমাণু বিজ্ঞানের বহুমুখী দিক-কে কাজে লাগাতে গিয়ে ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র যে ধরনের কর্মসূচী নিয়েছে তা যে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তবে ট্রম্বেতে বসেই কিছু কিছু সমালোচনাও যে শুনিনি, বলব না। একজন বললেন, সব ভাল। তবে ইদানীং এখানকার বিজ্ঞানীদের মধ্যে যেন আত্মম্ভরিতাও দেখছি। কেউ কেউ নিজেদের বিশেষ স্তরের মানুষ বলে মনে করেন। আর একজন বললেন, কাজের চেয়ে নিজেদের পাওনাগণ্ডাই এখন বেশি ভাবছেন কেউ কেউ। কি করে চল্লিশ বছরের মধ্যে কোন গ্রুপের ডাইরেকটার হওয়া যায় সেই চিন্তা। অথচ ওই বয়েসটা তো চুটিয়ে কাজ করার সময়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সময়। আর একজনের মন্তব্য, এখানে বড়লোকিপনার আতিশয্য। দেশের বহু গবেষণাগার—প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন গবেষণাগার—গবেষণাগার সাজসরঞ্জামের জন্যে যৎসামান্য আর্থিক সাহায্য যোগাড় করতে গিয়ে তারা হিমসিম খেয়ে যায়। তুলনায় কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রম্বের এত খরচ এবং আতিশয্য যেন বেমানান। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র : কলপক্কম

এক

আমার প্রথম প্রশ্নটি ছিল এই : গুজরাটের তারাপুর এবং রাজস্থানের রানাপ্রতাপ সাগরে বসেছে ভারতের প্রথম এবং দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। আর এই কলপক্কমে আপনারা বসিয়েছেন এ দেশের তৃতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। যার নাম দেওয়া হয়েছে মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্ট। কথা ছিল, ১৯৮০ সালেই এখানকার প্রথম ইউনিটটি চালু হবে। কিন্তু এখনও হয়নি। কবে নাগাদ এটি চালু হবে ?

প্রজেক্ট ম্যানেজার শ্রীরাও বললেন, আমরা দুটি ইউনিট বসিয়েছি। প্ল্যানমত এ বছরের মাঝামাঝি এক নম্বর ইউনিটকে 'ক্রিটিক্যাল' করার কথা ছিল, এবং তার আঠারো মাস পর দ্বিতীয় ইউনিটটির 'ক্রিটিক্যাল' হওয়ার কথা। (ক্রিটিক্যাল হওয়া মানে পরমাণু বিভাজনের শুরু।) অনিবার্য কারণে আমরা এখনও পর্যন্ত প্রথম ইউনিটটি চালু করতে পারিনি। আসল কথা আমরা কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদ্যায় আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। আপনি হয়ত জানেন সে কাজ করতে গিয়ে আমাদের বিদেশীদের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল বেশী। রানাপ্রতাপ সাগরের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে ভারতীয় পরমাণুবিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদরা অনেকটা আত্মনির্ভর হতে পেরেছিলেন। আর ভারতের এই তৃতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি তৈরির সময় নিজেদের পুরোপুরি স্বনির্ভর করে গড়ে তোলাই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য। আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তির সাহায্যেই মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার প্ল্যান্ট গড়ে তোলা হচ্ছে। এখানে আমরা কাজে লাগাচ্ছি রানাপ্রতাপ সাগরের মতন 'ক্যানডু' ধরনের চুল্লি। তবে তার নকশাটি আমরা আমাদের নিজেদের সুবিধে মত তৈরি করেছি। মাত্র পনের শতাংশ মালপত্র আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছে। মূল পারমাণবিক চুল্লিটির শতকরা একশো ভাগই তৈরি করেছেন আমাদের কুশলীরা। যে যন্ত্রের সাহায্যে চুল্লির মধ্যে নিয়মিত পারমাণবিক জ্বালানি ভরতে হয় সেই যন্ত্রও তৈরি হয়েছে এদেশে। তার পুরোপুরি নকশাটি তৈরি করেছেন ডিপার্টমেণ্ট অব অ্যাটমিক এনার্জির ইঞ্জিনিয়াররা। যে নকশাটি অবলম্বন করে এখানকার পারমাণবিক চুল্লি তৈরি হয়েছে, ওই একই নকশার উপর নির্ভর করে পাঁচশো মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী চুল্লি পরে তৈরি করা হবে। এবং আরও একটি বড় দিক, এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এখানকার দুটি ইউনিটকেই ঢেকে

রাখা হয়েছে বিশেষ ধরনের কংক্রিটের দুটি পুরু আস্তরণের সাহায্যে। ভারতে এ ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এই প্রথম। দুর্ভাগ্যবশত চুল্লিতে যদি কখনও বিস্ফোরণ ঘটে ইউনিটের দুটি পুরু দেওয়াল সেই বিস্ফোরণ প্রতিরোধ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে চুল্লির তেজস্ক্রিয় সামগ্রীর মুক্ত পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ার কোন আশংকা নেই। জননিরাপত্তার জন্যে এটা দরকার। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমরা কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। চালু করার আগে ইউনিট দুটির যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি আমরা সম্ভাব্য সবরকম ভাবেই পরীক্ষা করে নিতে চাই। এ কাজ শেষ হতে আরও সময় লাগবে তিন থেকে চার মাস। এর পর আরও তিরিশ দিনের মত সময় দরকার ওই সব সাজ সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি শুকিয়ে নিতে। আমার বিশ্বাস খুব শীগগির প্রথম ইউনিটটি আমরা চালু করতে পারব।

প্রশ্ন ঃ মিঃ রাও, আপনি বললেন রানাপ্রতাপ সাগরের মত এখানেও আপনারা কাজে লাগাচ্ছেন 'ক্যানড্যু' টাইপ চুল্লি। আমরা জানি, এই চুল্লিতে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম। সুখের কথা, ভারতে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। অতএব জ্বালানির জন্যে আমাদের আর বিদেশের উপর নির্ভর করতে হবে না। তারাপুরের দৃষ্টান্ত সামনে রেখেই কথাটা আমি তুলছি। তারাপুরের পারমাণবিক চুল্লির জ্বালানি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম। কথা ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ব্যবসায়িক চুক্তিতে এই ইউরেনিয়াম আমাদের নিয়মিত সরবরাহ করবে। কিন্তু গত কয়েক বছরে এ নিয়ে প্রচুর জল ঘোলা হয়েছে। বলতে কি, তারাপুরের ব্যাপারে আমরা প্রায় মার্কিন দেশের খপ্পরে আটকে পড়েছি। কিন্তু এই যে আপনারা 'ক্যানড্যু' টাইপ চুল্লি ব্যবহার করছেন, এর জন্যে প্রয়োজন 'হেভী ওয়াটার' বা ভারী জল। আমাদের দেশে চারটি ভারী জল উৎপাদনের প্ল্যাণ্ট তৈরি করেছেন আপনারা। ওই সব কারখানা থেকে এতদিনেও নির্ভরযোগ্যভাবে ভারী জল উৎপাদনে আপনারা সক্ষম হননি। যদি ভারী জলই না পেলেন, কী করে চলবে আপনাদের এই পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র? শুনেছি, সোভিয়েত দেশ আমাদের ভারী জল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অর্থাৎ আবার সেই পরনির্ভরশীলতা। ভারী জলের ব্যাপারে যদি সোভিয়েত দেশের সঙ্গে আমাদের আমেরিকার মত প্যাঁচ কষাকষি শুরু হয়, ওদের কাছ থেকে যদি ভারী জল না আসে, সে ক্ষেত্রেও কি আপনারা ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করতে পারবেন?

আমার প্রশ্ন শুনে মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠলেন শ্রীরাও। তারপর খানিকটা স্বগতোক্তির মতই যেন বললেন আমি দুঃখিত মিঃ কর। আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। ভারী জলের কথা যদি তোলেন, আমি বলব 'আই ডোণ্ট হ্যাভ এ গ্রাম অব ইট'।

প্রশ্ন ঃ আমি জানি না, আপনাকে আমি বিব্রত করছি কী না। শুধু কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যেই আপনাকে আমি আরও একটি প্রশ্ন করতে চাই। কোটি কোটি টাকা খরচ করে দেশে চার-চারটে ভারী জলের প্ল্যাণ্ট বসান হয়েছে অনেক দিন। তবু ভারী জল উৎপাদনে বাধা কোথায়? আপনি কি মনে করেন, যথাযথ প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাবই এর অন্যতম কারণ।

উত্তর ঃ আপনার শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটি ব্যাপার আপনিও হয়ত বুঝতে পারবেন। ভারী জল উৎপাদনে খরচ অনেক। যদি পৃথকভাবে আমরা ভারী জল উৎপাদনের কারখানা তৈরি করি, তাতে খরচ পড়বে আরও বেশী। একথা ভেবেই পারমাণবিক শক্তি কমিশন স্থির করেন, এ ব্যাপারে সার উৎপাদন কারখানাগুলির সাহায্য নিলে কেমন হয়। দেশে বেশ কয়েকটি বড়সড় সার উৎপাদনের কারখানা রয়েছে। প্রচুর পরিমাণ হাইড্রোজেন তৈরি করেন তাঁরা। হাইড্রোজেনের অন্যতম আইসোটোপ ডয়েটেরিয়াম প্রাকৃতিক জলের মধ্যেই থাকে যৎসামান্য পরিমাণ ভারী জল। যাকে বলা হয় ডয়েটেরিয়াম অকসাইড। জল থেকে হাইড্রোজেন সংগ্রহ করার সময় তার সঙ্গে কিছুটা ডয়েটেরিয়ামও পাওয়া যায়। এই ডয়েটেরিয়ামের সঙ্গে অকসিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে ভারী জল উৎপাদন করা যায়। আমরা ভেবেছিলাম সার তৈরির জন্যে প্রচুর খরচ করে হাইড্রোজেন উৎপাদনের ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে ডয়েটেরিয়াম সংগ্রহ করলেই তো হয়? এতে ডয়েটেরিয়াম উৎপাদনের খরচ পড়বে কম। কারণ, এ বস্তুটি তো এখানে বাইপ্রোডাকট বা উপদ্রব্য হিসেবেই পাওয়া যাচ্ছে। এই ভেবেই এক-একটি সার কারখানার পাশে আমরা ভারী জল উৎপাদনের প্ল্যাণ্ট বসানোর পরিকল্পনা নিই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, অনেক সময় সার কারখানাগুলিই অচল থাকে। ফলে ভারী জল উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই তালচেরের সার কারখানার কথাই ধরুন না। বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং নানা কারণে এই কারখানাটি এখন বন্ধ। এখানে ভারী জল উৎপাদনের একটি প্ল্যাণ্ট বসান হয়। অতএব সেই প্ল্যাণ্টও এখন বন্ধ।

প্রশ্ন ঃ এর জন্যে বিকল্প কী ভাবছেন আপনারা?

উত্তর ঃ আমরা ঠিক করেছি, আর কারোর লেজুড়ে নয়। ভারী জল তৈরীর জন্যে রাজস্থানের কোটায় একটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র প্ল্যাণ্ট তৈরি হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এখান থেকেই আমরা প্রয়োজনমত ভারী জল সংগ্রহ করতে পারব। সে ক্ষেত্রে বিদেশীদের উপর আমাদের আর নির্ভর করতে হবে না।

প্রশ্ন ঃ মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশনের প্রথম ইউনিটটি চালু করতে গেলে কতটা ভারী জল দরকার?

উত্তর ঃ ২৪০ টন।

প্রশ্ন ঃ মিঃ রাও, শুনেছি এক একটি পারমাণবিক চুল্লির জীবনকাল পঁচিশ

থেকে ত্রিশ বছরের মত। এটা যাতে বাড়ান যায়, সে ব্যাপারে কি কোন চেষ্টা করেছেন আপনারা, অন্তত এখানে?

উত্তর ঃ সেদিকটাও আমরা খতিয়ে দেখছি। এর জন্যে গবেষণাও চলছে। সেই গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর নির্ভর করে এখানকার ইউনিটগুলির আমরা নকশা তৈরি করেছি। আমাদের বিশ্বাস, মাদ্রাজের ইউনিট কম করেও নির্ভর-যোগ্যভাবে ৪০ বছর বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে পারবে। তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হবে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মত।

সমালোচকরা যত বিরূপ মন্তব্যই করুন না কেন, কলপক্কমের একান্ন মিটার উঁচু সেই গম্বুজাকৃতি বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়ালে, আমার বিশ্বাস আপনিও গর্ব বোধ করবেন। মাদ্রাজ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এটা প্রথম ইউনিট। আরও একটি ইউনিট বসান হয়েছে এটির পাশেই। প্রথম ইউনিটটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। দ্বিতীয় ইউনিটটির কাজ এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে। চালু হওয়ার পর প্রতিটি ইউনিট থেকে পাওয়া যাবে ২৩৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি। এই বিদ্যুৎ তামিলনাড়ু এবং তার আশপাশের অঞ্চলে যে প্রাণের সঞ্চার ঘটাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

আরও আছে। এই কলপক্কমেই। মাদ্রাজ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের অদূরে ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদরা গড়ে তুলছেন নতুন প্রজাতির পরীক্ষামূলক একটি পারমাণবিক চুল্লি। ব্রীডার রিঅ্যাকটার (পরবর্তী অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করব)। এই উদ্যোগ পৃথিবীর পারমাণবিক মানচিত্রে একটি বিশিষ্টতম সংযোজন।

গত তেইশ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ থেকে পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের গাড়িতে যখন কলপক্কমের পথে রওনা হলাম তখন সকাল সাড়ে নটা। মাদ্রাজ শহর পেরিয়ে গাড়ি ছুটল দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর। শহর পেরিয়ে শহরতলী। তারপর ছোট ছোট দু'একটি গ্রাম। হালকা বন জঙ্গল। পথে পড়ল ভারতের প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষ মহাবলীপুরম। মাদ্রাজ থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরে। মহাবলিপুরম পেরুতেই দেখা গেল, দূরে, একটি সুউচ্চ চিমনির ডগা।

চালক কেশবন বলল, ওই হল মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্টের চিমনি, স্যার। আমাদের আরও প্রায় পাঁচ কিলোমিটার যেতে হবে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে দিয়ে পৌঁছলাম। একটু এগুতেই ডানপাশে পড়ল রিঅ্যাকটার রিসার্চ সেণ্টার। যেখানে ব্রীডার রিঅ্যাকটার নিয়ে গবেষণা চলছে। এখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে মাদ্রাজ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র।

হ্যাঁ এই হল কলপক্কম। শহর এবং লোকালয় থেকে বহু দূরে নির্জন

পরিবেশ। বছর পনের আগেও বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী এই অঞ্চলে লোক-সমাগম ছিল না বললেই চলে। পূর্বে সমুদ্র। পশ্চিমে বেলাভূমির উপর গড়ে তোলা হয়েছে কৃত্রিম অরণ্য। ইউকেলিপটাস এবং ঝাউগাছের বাহার। এখানে রাতদিন কাজ করছে প্রায় তিন হাজার মানুষ। তাদের কেউ বিজ্ঞানী, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ শ্রমিক। কর্মীদের জন্যে তৈরি হয়েছে উপনগরী। সেখানে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সমবায় বিপণী, সাংস্কৃতিক সংঘ সব কিছুই দেখতে পাবেন। আর দেখতে পাবেন সবার উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে চিমনি এবং ইউনিট দুইটির গম্বুজাকৃতি মাথা।

পাওয়ার প্রজেক্টে পেঁছানোর পর প্রথমে "দেশ" পত্রিকার তরফ থেকে শ্রী এম, হরিপ্রসাদ রাও-এর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকার।

সাক্ষাৎকারের পর জনৈক ইঞ্জিনিয়ার বললেন, চলুন এক নম্বর ইউনিটটি আগে দেখে নিন। পরে আরও কথাবার্তা বলা যাবে।

তাঁর সঙ্গে বাইরে বেরুতেই চোখে পড়ল এক দঙ্গল কর্মী। কেউ ঝালাই-এর কাজ করছেন। কেউ বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন।

এক নম্বর ইউনিটটি একটি বৃত্তাকার বাড়ি। যার মাথা গম্বুজের মত দেখতে। বাড়িটির ব্যাস প্রায় চল্লিশ মিটার। উচ্চতা একান্ন মিটার। দ্বিতীয় ইউনিটটিও একই রকম দেখতে। ভেতরে পুরু চাপ সহ কংক্রিটের দেওয়াল। সেই দেওয়ালের বাইরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে নুড়ি-পাথর দিয়ে তৈরি আরও একটি দেওয়াল। দেওয়ালের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে এক কিলো-গ্রামের মত। আকস্মিক বিস্ফোরণের আঘাতে দেওয়াল যাতে না ভেঙে যায়, অথবা তাতে ফাটল না ধরে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। বাড়িটির ভেতরে রয়েছে একটি জলাধার। ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানির অবশেষ এখানে জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। এর ফলে তাদের তেজস্ক্রিয়তা অনেকটা কমিয়ে আনা যাবে।

গ্যাসরোধী দুইটি পুরু দরজার ভেতর দিয়ে পারমাণবিক ইউনিটটির মধ্যে গিয়ে যখন ঢুকলাম, সে যেন এক এলাহি ব্যাপার। একপাশে বসান হয়েছে পারমাণবিক চুল্লি। পারমাণবিক বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে এখানে ব্যবহার করা হবে ভারী জল। এ ছাড়া উচ্চচাপে ভারী জল প্রবাহিত করে চুল্লিটি শীতল রাখারও ব্যবস্থা হয়েছে। এই চুল্লির মধ্যে নিউট্রন কণার আঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণু ভেঙে গিয়ে তৈরি করবে বিভিন্ন আইসোটোপ, তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ এবং উত্তাপ। এই উত্তাপের পরিমাণ প্রায় সাড়ে সাতশ মেগাওয়াটের মত। তবে তার সবটাই যে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে, তা নয়। উত্তাপের সাহায্যে তৈরী হবে বাষ্প। সেই বাষ্পের চাপে টারবাইন ঘুরিয়ে তৈরি করা হবে বিদ্যুৎ-শক্তি। মাত্র তিরিশ শতাংশ উত্তাপশক্তি রূপান্তরিত হবে বিদ্যুৎশক্তিতে।

চুল্লিতে ব্যবহার করা হবে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম। এই ইউরেনিয়াম বিহারের যদুগোড়ার খনি থেকে সংগ্রহ করা হয়। এর ভেতর থাকে দুই রকম ইউরেনিয়াম আইসোটোপ। ইউরেনিয়াম—২৩৮১, ৯৯.৭ শতাংশ, এবং ইউরেনিয়াম—২৩৫,০.৩ শতাংশ। হায়দ্রাবাদের নিউক্লিয়ার ফ্যুয়েল কমপ্লেকস এই খনিজ প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামকে জটিল পদ্ধতির সাহায্যে রূপান্তরিত করবে ইউরেনিয়াম অকসাইডে। গাঢ় খয়েরি রঙের এই অকসাইডকে তৈরি করা হবে ছোট্ট বড়ির মত করে। ইংরেজিতে যাদের বলা হয় পেলেট। ৪৯.৫৩ সেন্টিমিটার এক একটি জারকোনিয়াম ধাতুসংকরের নলের মধ্যে এদের পুরে দেওয়া হয়। তারপর এ ধরনের উনিশটি নলকে একত্রিত করে তৈরি করা হয় এক একটি গুচ্ছ। যার ব্যাস ৮.১৩ সেন্টিমিটারের মত। ইউরেনিয়াম জ্বালানি বোঝাই এই গুচ্ছগুলি চুল্লির মধ্যে রেখে দেওয়া হয় পারমাণবিক বিভাজনের জন্যে। পি রাওকে প্রশ্ন করেছিলাম একেকটি ইউনিট চালু করার জন্য কতটা জ্বালানি এবং ভারী জল দরকার হবে বলে আপনার মনে হয়।

শ্রীরাও বললেন, গোড়ায় আমাদের দরকার ছাপ্পান্ন টন প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম এবং আড়াই শ টন ভারী জল। পরে দৈনিক একশ কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম হলেই চলবে।

ইউনিটের এক পাশে প্রায় তিনতলা উঁচুতে রয়েছে বিরাট টারবাইন। চালু হওয়ার পর এই টারবাইন প্রতি মিনিটে তিন হাজার বার ঘুরবে। আর তার ঘোরার জন্যে যে বলের প্রয়োজন সেটা যোগাবে আড়ই শ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বাষ্প। বলের পরিমাণ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে চল্লিশ কিলোগ্রামের মত। জলীয় গ্যাস থেকে বাষ্পকে পৃথক করে নেওয়ার ব্যবস্থাও রেখেছেন তাঁরা। কারণ টারবাইনের সংস্পর্শে যে গ্যাস আসবে সেটা সব সময় শুকনো থাকা দরকার। নইলে টারবাইন মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যাবে।

ইউনিট এবং তার যাবতীয় সাজ সরঞ্জার ঠাণ্ডা রাখার জন্যে এখানে দরকার প্রচুর জল। প্রতি মিনিটে দু মিলিয়ন লিটারের মত। এই জল তাঁরা সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করবেন। সে ব্যবস্থাও দেখলাম। এর জন্যে তৈরী হয়েছে একটি ডুবন্ত টানেল। লম্বায় প্রায় চারশ আটষট্টি মিটার। এই টানেল সমুদ্রের নিচে ভূস্তরের পঁয়ষট্টি মিটার গভীর অঞ্চল থেকে নিয়মিত জল সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবে পারমাণবিক ইউনিট দুটিতে।

প্রথম ইউনিটটির পাশে সুইচ ইয়ার্ড। ইয়ার্ড না বলে বরং বলি একশ মিটার লম্বা একটি বাড়ি। এর মধ্যে রয়েছে পাওয়ার গ্রিড। পারমাণবিক বিদ্যুৎ এই সব গ্রিডের মধ্যে দিয়েই বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমার সঙ্গী সেই ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক বললেন, এই সুইচ ইয়ার্ডের ব্যাপারে

আমরা এখানে একটি নতুন ব্যবস্থা নিয়েছি, মিঃ কর। তারাপুরের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রও সমুদ্রের কাছে অবস্থিত। সেখানকার সুইচ ইয়ার্ড উন্মুক্ত জায়গায় বসানর ফলে কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। আরব সাগরের নোনা বাতাস এবং জলীয় বাষ্প এর জন্য দায়ী। এই ত্রুটি দূর করার জন্যেই এখানকার সুইচ ইয়ার্ডটি পুরোপুরি একটি ঢাকা বাড়ির মধ্যে আমরা তৈরি করেছি। এতে করে আর্দ্র বাতাস এবং নোনা আবহাওয়ার হাত থেকে এখানকার সাজ-সরঞ্জাম রেহাই পাবে।

শ্রী রাও বললেন, অসুবিধের কারণ নেই। মাদ্রাজ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভারী জল পাবে। পাবে কোটা, বরোদা তালচের এবং টুটিকোরিনের ভারী জলের প্ল্যান্ট থেকে। এ ব্যাপারে পারমাণবিক শক্তি দপ্তর যথেষ্ট সচেষ্ট।

এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি এবং সাজ-সরঞ্জামের ব্যাপারে সাহায্য করছেন ভারত হেভী ইলেকট্রিকেলস লিমিটেড, লারসেন অ্যান্ড টারবো, কিরলোস্কার ফ্রিক, হিন্দুস্থান ব্রাউন বোভেরি, ইংলিশ ইলেকট্রিক, ইয়ামুনস, ডিজেল লোকোমোটিভ, ইলেকট্রনিক করপোরেশন অভ ইনডিয়া লিমিটেড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া রয়েছে ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র, হায়দ্রাবাদের নিউক্লিয়ার ফ্যুয়েল কমপ্লেকস, প্রভৃতি।

সাহায্যকারী বয়েলারের সাহায্যে এক নম্বর ইউনিটের টারবাইনটিকে ঘুরিয়ে তার নির্ভরযোগ্যতা ইতিমধ্যে প্রমাণ করে নিয়েছেন এখানকার কুশলীরা। ২১ মে, ১৯৭৯ এই পরীক্ষাটি শেষ হয়। ১২ জুলাই, ১৯৭৯ জেনারেটারটিরও কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে। বিদ্যুৎশক্তি পরিবহণ-ব্যবস্থার কাজও শেষ। এক নম্বর ইউনিটের দেওয়ালের উপর পরীক্ষা শেষ। কোন রকম তেজষ্ক্রিয়তা যাতে সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে পরিবেশ না দূষিত করতে পারে সে সম্পর্কে যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থাটিও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন তাঁরা।

"তবু", শ্রীরাও বললেন, "আমরা এতটুকু ঝক্কি নিতে চাই না। সমস্ত রকম ব্যবস্থা আমরা আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নিতে চাই। কারণ একবার চালু হয়ে গেলে, ইউনিটের ভেতরে যদি কিছু গোলমাল দেখা দেয় সেটা হবে ঝক্কির শামিল।"

কথাটা ঠিক। এখন যেমন নিরাপদে ইউনিটের মধ্যে থেকে ঘুরে এলাম, তখন তো আর সেটা সম্ভব হবে না। কারণ সেখানকার পরিবেশ তখন তেজষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকবে। সেখানে যাওয়া মনে যমের দরজায় যাওয়া। সেখানকার গোলমাল সামলাবে একমাত্র যান্ত্রিক ব্যবস্থা। শুধু যন্ত্রের উপর সব কিছু নির্ভর করা চলে?

তবু যা দেখে এলাম তাতে স্বীকার হবে, পারমানবিক প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারতীয় এখন স্বয়ম্ভর। মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার সাফল্য এটা প্রমাণ করেছে।

দুই

বাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম। বাঙ্গালোর ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার সদর দপ্তর। 'দেশ' পত্রিকার তরফ থেকে আগেই যোগাযোগ করা হয়েছিল। ওই সময় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস সি ধাবনের সঙ্গে একটি একান্ত সাক্ষাৎকারেরও ব্যবস্থা করা হয়। ডঃ ধাবন টেলেক্সে খবর পাঠান, ২০ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। কথাবার্তা ওই সময়ই হবে (পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে লিখব)।

কলকাতা থেকেই ঠিক করে নিয়েছিলাম, বাঙ্গালোরে গিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরীর কেন্দ্রটিও দেখব। দেখব ইনডিয়ান ইন্সটিটিউট অভ অ্যাসট্রোফিজিকস। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে এই প্রতিষ্ঠানটি এখন শিরোনাম। এ ছাড়া একদিন গিয়ে ঘুরে আসব মহীশূরের ফুড অ্যান্ড টেকনলজিক্যাল রিসার্চ ইনসটিটিউট থেকে। তারপর ফেরার পথে মাদ্রাজ হয়ে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র শ্রীহরিকোটা। আর মাদ্রাজে যখন যাচ্ছি তখন কলপক্কমের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং রিঅ্যাকটার রিসার্চ সেন্টারই বা বাদ যায় কেন ?

কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার আগে কলপক্কমে যাওয়ার ব্যাপারে যোগাযোগ করেছিলাম কলকাতার লবণ হ্রদের ভেরিয়েবল্ এনার্জি সাইক্লোট্রন প্রজেক্টের অধ্যাপক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বললেন, ঠিক কোন্ দিন তুমি কলপক্কমে যেতে চাও বলে দাও। আমি ব্যবস্থা করছি।

অনিবার্য কারণে সে ব্যবস্থা তিনি করে উঠতে পারেন নি। ১৬ সেপ্টেম্বর দুপুর দেড়টায় বাঙ্গলোরের ফ্লাইট। এগারটার সময় অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় জানালেন কলপক্কম দেখতে গেলে বোম্বাই থেকে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সদর দপ্তরের অনুমতি দরকার। সেখানে তোমার পুরানো বন্ধু মিঃ এ এস রাজ আছেন। পারমাণবিক শক্তি কমিশনের তিনি এখন প্রধান জন-সংযোগ অধিকর্তা। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে অনুমতি পাওয়া শক্ত হবে না।

তাঁর কথা শুনে আমার তো মাথায় হাত। ফ্লাইট দেড়টায়। দমদম বিমানবন্দরে রিপোর্ট করতে হবে সাড়ে বারোটায়। এত কম সময়ে বোম্বাই-এর সঙ্গে কী করে যোগাযোগ করব ?

ঠিক করলাম বিমানবন্দর থেকে টেলেকসে খবর পাঠাব। কিন্তু সেখানে গিয়েও অবাক হলাম। এত বড় বিমানবন্দর। কিন্তু সেখানকার রিসেপশন আমাকে বললেন, এখানে তো কোন পাবলিক টেলেক্স সারভিস নেই। হঠাৎ মনে হল, তা হলে 'দেশ' পত্রিকার দপ্তরে টেলিফোনের মাধ্যমে মেসেজটা পাঠিয়ে দিই না কেন ? আনন্দবাজার থেকে টেলেকস-এ মেসেজটি পাঠান যেতে পারে।

গেলাম বিমানবন্দরের পোস্ট অফিসে। কিন্তু কম করেও কুড়িবারের মত চেষ্টা করেও আনন্দবাজার পত্রিকার লাইন পাওয়া গেল না। কলকাতার টেলিফোন ব্যবস্থার কী পরিণতি! অতএব কলপক্কমে যাওয়ার ব্যাপারটা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।

কিন্তু ভাগ্য ভাল। বাঙ্গালোরে গিয়ে ভারত হেভী ইলেকট্রিকেলস লিমিটেডের ম্যানেজার শ্রীবৈদ্যের সঙ্গে কথা বলতেই তিনি বললেন, আমাদের অফিস থেকেই কাল সকালে বোম্বাই-এর পারমাণবিক শক্তি কমিশনের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেব। কোন অসুবিধে নেই।

শ্রীবৈদ্যকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শ্রী এ এস রাজকেও। টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতেই তিনি বললেন, কবে যেতে চান কলপক্কম?

বললাম, ২৩ সেপ্টেম্বর।

ঠিক আছে। অসুবিধের কোন কারণ নেই। মাদ্রাজে পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের অফিস আছে। সেখানকার জনসংযোগ অফিসার মিঃ বিজয়রাঘবনকে আমি এখুনি জানিয়ে দিচ্ছি। তিনিই আপনার সফরের ব্যবস্থা করবেন। সম্ভব হলে ওঁর সঙ্গে আপনি একবার যোগাযোগ করুন। আমার কথা বলবেন ওঁকে।

কলপক্কমের পারমাণবিক চুল্লি বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্র
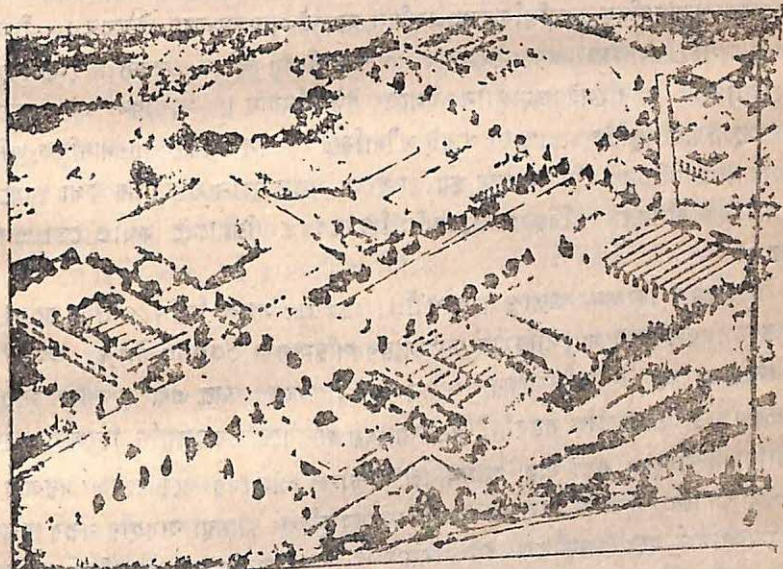
এর পর আর কোন অসুবিধে হয় নি। শ্রীবিজয় রাঘবনই ব্যবস্থা করে-ছিলেন সব। তিনি জানালেন, মিঃ রাজের মেসেজ পেয়েছি। তা ছাড়া মাঝে রাজ মাদ্রাজে এসেছিলেন। দু এক দিনের জন্যে। সেই সময় আপনার কথা বলেও গেছেন তিনি।

২৩ সেপ্টেম্বর সকালের দিকে দেখলাম কল্পক্কমের মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্ট। এ সম্পর্কে আগের অধ্যায়ে-এ লিখেছি।

পাওয়ার প্রজেক্টর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এম হরিপ্রসাদ রাও-এর ঘরে পরিচয় হল শ্রী এস আর পরানজপের সঙ্গে। কল্পক্কমের ব্রীডার রিঅ্যাকটার সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে যাঁর ভূমিকা অন্যতম।

পরানজপে বললেন, লাঞ্চের পর আসুন। রিঅ্যাকটার রিসার্চ সেণ্টারে বসেই কথা বলব, কেমন?

কল্পক্কমের এই কেন্দ্রটির নাম রিঅ্যাকটার রিসার্চ সেণ্টার। বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় পারমাণবিক চুল্লি বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র।

প্রশ্ন তুলবেন কেউ কেউ, তারাপুর এবং রাজস্থানে তো আমরা ইতিমধ্যেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বসিয়েছি। কল্পক্কমেও বসান হয়েছে আরও দুটি চুল্লি। যদি তাই হয় তা হলে পারমাণবিক চুল্লি নিয়ে আবার নতুন করে গবেষণার কারণ কী?

ভারতীয় পারমাণবিক শক্তির রূপকার ডঃ হোমী জাহাঙ্গীর ভাবার মনেও হয়ত এই একই প্রশ্ন জেগেছিল। ডঃ ভাবা বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এ দেশে পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদ্যায় একদিন যথেষ্ট পারঙ্গম হয়ে উঠবেন। কিন্তু তখন দেখা দেবে আর এক সমস্যা। পারমাণবিক শক্তির জন্যে চাই উপযুক্ত জ্বালানি। আর সেই জ্বালানি বলতে ইউরেনিয়াম। মুশকিল এই ভারতে এই মূল্যবান বস্তুটির ভাণ্ডার খুবই সীমায়িত। সে ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ যদি বাড়াতে হয় তা হলে নতুন কোন সম্ভাবনার কথা ভাবতে হবে। ইউরেনিয়ামের বিকল্প জ্বালানি হিসেবে থোরিয়ামের কথাও তো ভাবা যায়?

ডঃ ভাবা ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী। ১৯৫৮ সালে তিনি মন্তব্য করেন: ভারতে নিষ্কাশনযোগ্য থোরিয়াম ভাণ্ডারের পরিমাণ ৫,০০০০০ টন। অথচ সে তুলনায় এ দেশে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে তার এক দশমাংশ মাত্র। অতএব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইউরেনিয়ামের পরিবর্তে জ্বালানি হিসেবে যাতে থোরিয়াম ব্যবহার করা যায় তেমন ধরনের চুল্লি আমাদের গড়ে তোলা দরকার। প্রথম পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে যে সব চুল্লি আমরা ব্যবহার করব তাতে কাজে লাগান হবে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম। প্রথম পর্যায় বা প্রজাতির ওই সব চুল্লিতে তৈরী হবে প্লুটোনিয়াম। দ্বিতীয় প্রজাতির চুল্লিতে কাজে লাগান হবে এই প্লুটোনিয়াম কারণ ইউরেনিয়ামের মত প্লুটোনিয়ামও বিভাজিত হয়ে শক্তি দেয়। এই চুল্লিতে থোরিয়ামকে রূপান্তরিত করা হবে ইউরেনিয়াম-২৩৩ নামক আইসোটোপ। অথবা ইউরেনিয়ামকে রূপান্তরিত করা হবে অধিক পরিমাণ প্লুটোনিয়াম-এ। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই ব্যবস্থাকে বলা হবে অন্তর্বর্তীকালীন

ব্যবস্থা। সব শেষে তৈরী হবে ব্রীডার রিঅ্যাকটার বা প্রজননক্ষম পারমাণবিক চুল্লি। এ ধরনের চুল্লিতে শক্তি উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম-২৩৩ ব্যবহার করা হবে তার চেয়ে বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হবে ইউরেনিয়াম-২৩৩। বলা বাহুল্য, এর জন্যেই তৃতীয় পর্যায়ের এই চুল্লিকে ব্রীডার রিঅ্যাকটার বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটার বা পারমাণবিক চুল্লির কার্যপ্রণালী বলতে সঠিক কী বোঝায় ?

এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই ঃ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লিতে জ্বালানি হিসেবে যেমন আমরা ব্যবহার করে থাকি কয়লা, পারমাণবিক চুল্লিতে সেই রকম ব্যবহার করা হয়ে থাকে পারমাণবিক জ্বালানি। কয়লার ভেতর উত্তাপ শক্তি ধরা থাকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে। কয়লা যখন বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে তখন পাওয়া যায় উত্তাপ শক্তি, জল এবং নানারকম রাসায়নিক যৌগ। এই উত্তাপ শক্তির সাহায্যে জলীয় বাষ্প তৈরী করে, সেই বাষ্পের চাপে টারবাইন ঘুরিয়ে চালান হয় জেনারেটার। এই ভাবে দেখলে পারমাণবিক চুল্লিকেও বলা যায় উত্তাপের উৎস। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লিতে থাকে কয়লা (প্রাকৃতিক গ্যাসও ব্যবহার করা হয় কখনও কখনও), আর পারমাণবিক চুল্লিতে থাকে পারমাণবিক জ্বালানি ইউরেনিয়াম।

আরও একটি কথা। কয়লার রাসায়নিক বিক্রিয়া চালিয়ে উত্তাপ পেতে গেলে দুটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রথমত, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা না দিলে চুল্লি জ্বলে না। দ্বিতীয়ত, কয়লা জ্বালাতে গেলে প্রথমে বাইরে থেকে আগুন দিতে হয়। সেই আগুনে কয়লা একটা নির্দিষ্ট তাপ-মাত্রায় পেঁছিলে শুরু হয় রাসায়নিক বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ার ফলে কয়লা থেকে যে উত্তাপ নির্গত হয় তার কিছু অংশ আমরা বাষ্প তৈরির কাজে ব্যবহার করি। অবশিষ্ট অংশ অবশিষ্ট কয়লার রাসায়নিক বিক্রিয়া চালাতে সাহায্য করে। পারমাণবিক চুল্লির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা কতকটা এই রকম। সেখানেও পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু করতে গেলে দরকার ন্যূনতম নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়াম। যাকে বলা হয় 'ক্রিটিক্যাল মাস'। কয়লার রাসায়নিক বিক্রিয়া চালু করতে গেলে যেমন নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, পারমাণবিক বিভাজন চালু করতে গেলেও তেমনি দরকার নির্দিষ্ট তাপমাত্রা। এই তাপমাত্রাকে বলা হয় 'ক্রিটিক্যাল টেমপারেচার।' নিউট্রন কণার আঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজিত হয়। বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে কিছু কিছু পদার্থের আইসোটোপ, তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ, উত্তাপ শক্তি এবং আর কিছু নিউট্রন কণা। উত্তাপ শক্তিকে কাজে লাগান হয় বাষ্প তৈরি করতে। এই বাষ্পই চালায় টারবাইন। বিক্রিয়ার দরুন অতিরিক্ত যে নিউট্রন কণা বেরিয়ে আসে তারা অবশিষ্ট ইউরেনেয়াম পরমাণুদের বিভাজিত করে।

বিভাজনের পর আবার বের হয় নিউট্রন। তারা অবিভাজিত পরমাণুদের বিভাজিত করে। আর এই ভাবেই চলতে থাকে একটি শৃংখল বিক্রিয়া বা 'চেইন রিঅ্যাকশন।' কয়লা থেকে নির্গত উত্তাপ শক্তির কিছু অংশ যেমন কয়লার রাসায়নিক বিক্রিয়া চালাতে সাহায্য করে, তেমনি পারমাণবিক বিভাজনের সময় নির্গত নিউট্রন কণাদের কিছু অংশ পারমাণবিক বিক্রিয়া চালাতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন : প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের সাহায্যে যে পারমাণবিক বিক্রিয়া চালান হয় তার স্বরূপটি কী রকম ?

উত্তর : প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম, অর্থাৎ খনি থেকে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় তার মধ্যে থাকে ইউরেনিয়ামের দুই রকম আইসোটোপ। ইউরেনিয়াম-২৩৮ এবং ইউরেনিয়াম-২৩৫। প্রথমটির পরিমাণ ৯৯.৩ শতাংশ। দ্বিতীয়টির পরিমাণ ০.৭ শতাংশ। পারমাণবিক চুল্লিতে এই স্বল্প পরিমাণ ইউরেনিয়াম-২৩৫ই বিভাজনে অংশ গ্রহণ করে। ধীর গতির নিউট্রন যখন এক-একটি ইউ-রেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুর গায়ে আঘাত হানে, সেই পরমাণু তখন বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে বেরিয়াম, স্ট্রনসিয়াম প্রভৃতি তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ, উত্তাপ এবং তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ। এ ছাড়া দুই অথবা তিনটি নিউট্রন কণা। ধীর গতির নিউট্রনকেই বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন থার্মাল নিউট্রন।

এখানে একটি ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা দরকার। নিউট্রনের গতি যদি বেশি হয়, তার শক্তিও হবে বেশী। দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রন বা 'ফাস্ট' নিউট্রন হলে বিভাজনের কাজ চালান অসুবিধে হয়। এর জন্যে প্রথমেই দরকার নিউট্রনের গতি হ্রাস করা। এই হ্রাস করার জন্যে নিউট্রন কণাদের প্রথমে এক ধরনের বস্তুর গায়ে আঘাত করা হয়। আঘাতের ফলে নিউট্রনের গতি হ্রাস পায়। শেষোক্ত এই বস্তুটিকে বলা হয়, 'মডারেটার' বা 'গতিসাম্য বস্তু।' যে সব চুল্লিতে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয় সেই সব চুল্লিতে গতিসাম্য বস্তু হিসেবে এখন ভারী জল ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ভারী জলের অণুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নিউট্রনের প্রতি শ্লথ হয়। পরে সেই শ্লথ গতি নিউট্রন ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুকে আঘাত করে ঘটায় পারমাণবিক বিভাজন। উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক জলের গতি ৭০০০ ভাগের মধ্যে থাকে এক ভাগ ভারী জল। পারমাণবিক চুল্লির জন্যে ৯৯.৮ শতাংশ খাঁটি ভারী জল প্রয়োজন। যা পেতে গেলে অত্যন্ত জটিল এবং ব্যয়বহুল পদ্ধতির প্রয়োজন। প্রতিটি চুল্লির জনো দরকার (মাদ্রাজ পারমাণবিক চুল্লি) ২৩৫ টন ভারী জল। এই জল পারমাণবিক বিভাজনের গতিসাম্য বজায় রাখে, সেই সঙ্গে চুল্লিকে ঠাণ্ডা রাখতেও সাহায্য করে।

মাদ্রাজ পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র দেখে যখন রিঅ্যাকটার রিসার্চ সেণ্টারে গেলাম, তখন বিকেল তিনটে, ছায়াঘন পরিবেশ। কিন্তু মানুষের প্রাণচাঞ্চল্যে

ভরপুর। বিরাট এলাকা। এক প্রান্তে বসান হয়েছে 'ফাস্ট ব্রীডার টেস্ট রিঅ্যাকটার' বা দ্রুত প্রজননক্ষম পরীক্ষামূলক পারমাণবিক চুল্লি। এই চুল্লিটির অনেকটা এগিয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ্‌রা পুরোপুরি নিজেদের চেষ্টাতেই গড়ে তুলেছেন এই চুল্লিটি। এটির বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই চুল্লিই এখন এই কেন্দ্রটির প্রাণ। প্রধান বিষয় বস্তু।

শ্রীপরানজপে আমার জন্যে তাঁর গবেষণাগারের গেটের সামনেই অপেক্ষা করছিলেন। দেখা হতেই বললাম, এখানকার গবেষণার কাজ দেখার আগে ব্যাপারগুলি তো বুঝে নিতে হবে। আই নিড স্কুলিং।

মৃদু হাসলেন পরানজপে। অত্যন্ত সংযতবাক্‌ মানুষ। চলনে এবং কথায় অসামান্য স্বচ্ছতা। দেখাতে কথা বলতে গিয়ে কখনও তিনি অপ্রাসঙ্গিক হন না।

একটি ঘরে গিয়ে মুখোমুখি বসতেই তিনি শুরু করলেন, মিঃ কর প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম কী, সে তো আপনি জানেন। ব্যাপারটা আমরা তা হলে এই ভাবে শুরু করি। পারমাণবিক বিভাজনের দিক দিয়ে বস্তুকে আমরা দুটি শ্রেণীতে পৃথক করতে পারি। এক ধরনের বস্তুর পরমাণু নিউট্রনের আঘাতে বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে নানা রকম আইসোটোপ, উত্তাপ, বিকিরণ এবং নিউট্রন কণা। যেমন ধরুন ইউরেনিয়াম-২৩৫। এ ধরনের বস্তুকে বলা হয় 'ফিসাইল সাবস্ট্যান্স' বা বিভাজনক্ষম বস্তু। আবার আর এক ধরনের বস্তু আছে যাদের পরমাণুর গায়ে নিউট্রন আঘাত করলে সেই নিউট্রন কণাকে শোষণ করে নেয়, বিভাজিত হয় না। এ ধরনের বস্তুকে বলা হয় 'ফারটাইল সাবস্ট্যান্স' বা উর্বর বস্তু। প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের ৯৯.৩ শতাংশই ইউরেনিয়াম-২৩৮। ইউরেনিয়াম-২৩৮ বিভাজিত হয় না। চুল্লির ভেতর ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর বিভাজন চলা কালে অতিরিক্ত যে নিউট্রন কণা বেরিয়ে আসে তার বেশ কিছু অংশ এই ইউরেনিয়াম-২৩৮ পরমাণু শোষণ করে প্রথমে রূপান্তরিত হয় নেপ-চুনিয়াম-২৩৯ নামে এক ধরনের তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ। পরে প্রতিটি নেপ-চুনিয়াম থেকে নির্গত হয় একটি বিটা কণা। এই ঘটনাকে বলা হয় 'বিটা ডিকে'। 'বিটা ডিকে'র ফলে নেপচুনিয়াম-২৩৯ রূপান্তরিত হয় প্লুটোনিয়াম-২৩৯ আইসোটোপে। এই প্লুটোনিয়াম-২৩৯ 'ফিসাইল সাবস্ট্যান্স'। ইউ-রেনিয়াম-২৩৫র মত এই আইসোটোপটিকেও বিভাজিত করে শক্তি উৎপাদন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ তাই যদি হয় তা হলে এই প্লুটোনিয়ামকেও তো আমরা শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে কাজে লাগাতে পারি ?

উত্তর ঃ অবশ্যই পারি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও কিছুটা সমস্যা রয়েছে। প্রথমত ধরুন, পারমাণবিক চুল্লিকে আমরা দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। একটি

হল থার্মাল রিঅ্যাকটার। যেখানে কম গতিসম্পন্ন নিউট্রন কণার আঘাতে পারমাণবিক বিভাজন ঘটান হয়। তারাপুর, রাজস্থান মাদ্রাজ এমন কি নারোরায় যে ধরনের চুল্লি বসান হয়েছে বা হচ্ছে তাদের সবই এই থার্মাল রিঅ্যাকটার। এই সব চুল্লিতে কম গতিসম্পন্ন (যার অর্থ কম শক্তিসম্পন্ন) নিউট্রন পারমাণবিক বিভাজন ঘটায়। ফলে যে পরিমাণ জ্বালানি (এ ক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম-২৩৫) খরচ হয়, সে তুলনায় প্লুটোনিয়াম তৈরি হয় কম। মাদ্রাজ অথবা রাজস্থানে এই পরিমাণ দাঁড়ানর কথা ০.৭ ভাগ। তারাপুরে আরও কম। ০.৫ থেকে ০.৬ ভাগ। পরিবর্তে এমন ধরনের চুল্লি যদি তৈরি করা যায় যেখানে অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রন কণার সাহায্যে পারমাণবিক বিভাজন করা হয়, সেখানে প্লুটোনিয়াম-২৩৯ তৈরি হবে বেশী। এক ভাগ ইউরেনিয়াম-২৩৫ খরচ করে পাবেন ১.২ থেকে ১.৫ ভাগ প্লুটোনিয়াম-২৩৯। ইউরেনিয়াম-২৩৮ থেকেই অবশ্য পাবেন। এ ধরনের চুল্লিকেই আমরা বলছি 'ব্রীডার রিঅ্যাকটার'। অতিরিক্ত প্লুটোনিয়াম পেলে আমরা পারমাণবিক বিভাজনে হাত দিতে পারি।

প্রশ্ন ঃ তাহলে আপনাদের মূল উদ্দেশ্য দাঁড়াচ্ছে এই। আপনি জানেন, আমাদের দেশে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের সঞ্চয় খুবই কম। তুলনায় এ দেশে প্রচুর পরিমাণ থোরিয়াম-২৩২ নামে এক ধরনের আইসোটোপ পাওয়া যায়। ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর এটিও 'ফারটাইল সাবস্ট্যান্স'। একটি থোরিয়াম-২৩২কে একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন বা 'ফাস্ট' নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে ওই পরমাণু নিউট্রন কণাটিকে শোষণ করে নিয়ে রূপান্তরিত হয় এক ধরনের আইসোটোপ। নাম ইউরেনিয়াম-২৩৩। এই ইউরেনিয়াম-২৩৩ কিন্তু 'ফিসাইল সাবস্ট্যান্স'। ইউরেনিয়াম-২৩৩-এর বিভাজন ঘটিয়ে আমরা পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করতে পারি। ভবিষ্যতে যাতে তা করা যায় তার দিকে লক্ষ রেখেই এখানকার গবেষণার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীপরানজপের কথা শুনতে শুনতে মনে মনে খুবই যে অবশ্যাত হচ্ছিলাম, বলাই বাহুল্য।

তিনি বললেন, মিঃ কর, পারমাণবিক বিক্রিয়ার পর চুল্লি থেকে বের করে নেওয়া হয় 'স্পেণ্ট ফুয়েল'। কয়লার চুল্লি থেকে যেমন পাই ছাই, বলতে পারেন এও ঠিক কতকটা সেই রকম। অবশ্য ছাই-এর মত অমন গুঁড়ো বস্তু নয়। যাই হোক, যা বলছিলাম যে সব চুল্লি এখন কাজ করছে পারমাণবিক প্রজ্বলনের পর তার প্রত্যেকটি থেকে আমরা পাই তিন থেকে চার কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম, দু কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম-২৩৫ এবং ৯৯০ কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম-২৩৮ (প্রতি ১০০০ কিলোগ্রাম প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম খরচ করে)। বিশেষ পদ্ধতিতে ওই অবশেষ থেকে প্লুটোনিয়ামকে পৃথক করার ব্যবস্থা করেছেন

আমাদের বিজ্ঞানীরা। কলপক্কমে আমরা ফাস্ট ব্রীডার টেস্ট রিঅ্যাকটার তৈরি করছি। এই চুল্লির মধ্যে থাকবে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়ামের মিশ্রণ। চুল্লির মধ্যে থাকবে এই মিশ্রণ। এই মিশ্রণের বাইরের চারপাশটা ঘেরা থাকবে থোরিয়াম-২৩২-এর আস্তরণে। বিভাজনের সময় যে দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রন কণা সৃষ্ট হবে তার আঘাতে থোরিয়াম-২৩২ রূপান্তরিত হবে ইউরেনিয়াম-২৩৩-এ। যা ফিসাইল সাবস্ট্যান্স হিসেবে পরে আমরা ব্যবহার করতে পারব।

এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করেই তৈরি করা হবে পরবর্তী পর্যায়ের পারমাণবিক চুল্লি। ডঃ ভাবার ভাষার 'থার্ড জেনারেশন অব নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটার।' এই চুল্লির মধ্যে থাকবে ইউরেনিয়াম-২৩৩ জ্বালানি হিসেবে। চুল্লির চারপাশে থাকবে থোরিয়াম-২৩২। চুল্লিতে পারমাণবিক বিভাজন যখন চলবে, তখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রন। সেই নিউট্রন থোরিয়াম-২৩২কে রূপান্তরিত করে তৈরি করবে ইউরেনিয়াম-২৩৩। এবং দেখা যাবে জ্বালানি হিসেবে যতটা ইউরেনিয়াম-২৩৩ কাজে লাগান হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তার চেয়ে বেশি পরিমাণ ইউরেনিয়াম-২৩৩ তৈরি হয়েছে। শেষোক্ত এই বস্তুটি পরে আবার জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগান যেতে পারে। বলতে বাধা নেই, যেদিন এই পদ্ধতিটি আমরা বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারব, পারমাণবিক জ্বালানির জন্যে ভারতকে আর পরের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে না। দীর্ঘকাল ধরে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কাজও অব্যাহত ভাবে চলতে থাকবে।

*

শুনতে ভাল লাগলেও এ ধরনের উদ্যোগে বাধা আছে অনেক। প্লুটোনিয়াম আথবা থোরিয়াম নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রচুর বাধা। যেমন এক্ষেত্রে 'মডারেটর' এবং চুল্লিকে ঠাণ্ডা রাখা ভারী জলে সম্ভব নয়। এর জন্যে দরকার সোডিয়াম। সেই সোডিয়াম আবার থাকবে তরল অবস্থায়—যা অত্যন্ত উত্তপ্ত। সোডিয়াম প্রচণ্ড রকমের বিক্রিয়াশীল পদার্থ। তরল অবস্থায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষমতা তার আরও বেশী। সেই তরল সোডিয়ামকে যথাযথভাবে প্রবাহিত করার জন্যে দরকার বিশেষ ধরনের ধাতব টিউব। দেখলাম জটিল এই কাজেও সাফল্য অর্জন করেছেন আমাদের বিজ্ঞানীরা।

দরকার বিশেষ ধরনের চুল্লি যা প্রচণ্ডগতি-সম্পন্ন নিউট্রনের আঘাতে না ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তরল সোডিয়াম পাম্প করার পদ্ধতিও জটিল। দরকার তেজষ্ক্রিয় ধাতু-নিষ্কাশন ব্যবস্থা। অতিরিক্ত তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জামের রাসায়নিক এবং ভৌতিক ধর্মের কতটা পরিবর্তন ঘটাতে পারে, ঘটালে কী কী ধরনে সমস্যা দেখা দেবে, সেই সব সমস্যার প্রতিবিধান কীভাবে করা যায়, সে সব নিয়েও গবেষণা চলছে এখানে। এছাড়া

বাইনাকুলারের মধ্যে দিয়ে দেখলাম, দূরে ধূলো, মাটি এবং পাথরের ফোয়ারা। সোজা উপর দিকে উঠে গেল। ভারী ভারী বস্তুগুলি আবার যেখান থেকে আকাশের দিকে উঠে গিয়েছিল, সেখানেই নেমে পড়ল যেন।

আর সেই একই মুহূর্তে যে মাচাটির ওপর আমরা দাঁড়িয়ে কী সাংঘাতিক ভাবেই না সেটি দুলে উঠল। বুঝলাম, প্রবল ভূমিকম্প হল। এমন জোর সে কম্পন, সে অভিজ্ঞতা জীবনে কখনও আমি পাই নি। পরে জেনেছি, গৌর-বিদানার ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত সংবেদনশীল যে ভূ-কম্পমানকে যন্ত্র স্থাপন করেছেন, সেই যন্ত্রে ধরা পড়েছে এই কম্পনের পরিমাণ ৪.৮ (Richter Scale) তবে কানাডার বিজ্ঞানীরা তাঁদের যন্ত্রের সাহায্যে মেপে বলেছেন, এই ভূকম্পনের মাত্রা ৫.৬। এবং সুইডেন থেকে বলা হয়েছে ৫.৮।

যাই হোক, আমরা স্থির নিশ্চয়, যেমনটি আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম, সমস্ত ব্যাপারটা যে সেইভাবেই সম্পন্ন সমস্ত ব্যাপারটা যে সেইভাবেই সম্পন্ন হয়েছে, তাতে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। 'না এ ব্যাপারে আমরা কোন বাবা-টাবা বা নারকেল ভাঙ্গার ওপর বিশ্বাস আরোপ করি নি। একমাত্র পদার্থবিজ্ঞানের ওপরই পুরোপুরি আস্থা রেখে আমরা কাজ করে গেছি।

*

হ্যাঁ ৭ জুন, কলকাতার সাহা ইনসটিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এর বক্তৃতা গৃহে বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের ছাত্রদের এক জমাট পরিবেশে গত ১৮ মে রাজস্থান মরুভূমিতে ভারত পরীক্ষামূলকভাবে যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেকটার এবং এই ঘটনার বিশিষ্টতম নায়ক ডঃ রাজা রামান্না কতকটা এইভাবেই যেন তার বক্তব্য তুলে ধরলেন।

৬ জুন ডঃ রামান্না কলকাতায় এসেছিলেন মাত্র দু দিনের জন্যে। উদ্দেশ্য কলকাতার লবণ হ্রদে পরমাণু শক্তি কমিশন যে যে ভেরিয়েবল সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি বসানর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করা। যতদূর জানা গেছে, এশিয়ার বৃহত্তম এই পারমাণবিক ত্বরণ যন্ত্রটির দৈত্যাকার বৈদ্যুতিক চুম্বকটি জুলাই-আগস্ট নাগাদ কলকাতায় এসে পড়বে। এখন চলছে রীতিমত তোড়জোড়।

দমদম বিমানবন্দরে আমি একমাত্র সাংবাদিক। ডঃ রামান্না যে ওই দিন কলকাতায় আসছেন পরমাণু শক্তি কমিশনের কয়েকজন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী ছাড়া এ খবর আগে থেকে আর কেউই জানতে পারেন নি। আমি ছাড়া আর কোন সাংবাদিকও না।

প্লেন মিনিট পনর দেরি করে নামল আন্তর্জাতিক টার্মিনালের কাছে। সংরক্ষিত এলাকার কাছ ঘেঁষে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে ফটোগ্রাফার দেবীপ্রসাদ সিংহ।

দেবী বলল, ভীড়ের মধ্যে আমি হয়ত চিনতে পারব না। আপনি চিনিয়ে দেবেন।

এক মিনিট বিরতি।

দেখলাম ডঃ রামান্না আসছেন। কালো স্যুট। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছেন। সারা মুখে উজ্জ্বল হাসি। সঙ্গে রয়েছেন ডঃ পি কে আয়েঙ্গার। ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের পদার্থবিজ্ঞান শাখার প্রধান। ১৯৭২ সালের মে মাসে ট্রম্বেতে প্লুটোনিয়াম রিঅ্যাকটার ফর নিউট্রনিক ইনভেসটিগেসন ইন মালটিপ্লাইং অ্যাসেম্বলি অর্থাৎ সংক্ষেপে যার নাম রাখা হয়েছে পূর্ণিমা (PURNIMA) —এই নামে যে পারমাণবিক চুল্লিটির কাজ চালু করা হয়, সেটি তৈরি করার ব্যাপারে মূল দায়িত্ব ছিল ডঃ আয়েঙ্গারেরই ওপর। শতকতরা একশ ভাগ ভারতীয় প্রচেষ্টায় তৈরি এই চুল্লি ভারতের গবেষণার এক বিশিষ্টতম উদাহরণ।

সংরক্ষিত এলাকা ছেড়ে লাউঞ্জে ঢুকতেই ডঃ রামান্নার সঙ্গে সাক্ষাতেই শুভেচ্ছা জানালাম।

ডঃ রামান্না বললেন, তুমি এসে গেছ।

বললাম, আমরা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। আপনার নিজের মুখে পারমাণবিক বিস্ফোরণের কথা কিছু বলুন।

হেসে উঠলেন ডঃ রামান্না। বললেন, এখন না। কাল বলব। আমি তো পলিটিসিয়ান নই। যে তড়িঘড়ি বাণী দিয়ে বসব।

ব্যস্ত ছিলেন খুব। তা ছাড়া বুঝলাম, এসব ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি কিছু বলতে চান না।

তবে হ্যাঁ, পরদিন সাহা ইনস্টিটিউটে বিস্তারিত অনেক কিছুই বললেন।

●

সেই অভিজ্ঞতা। শ্রোতারা রুদ্ধশ্বাস।

যা দিয়ে গোড়ায় শুরু করেছিলাম। ডঃ রামান্নার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা। কয়েক শ' শ্রোতার সামনে বোর্ডে ছবি এঁকে দেখালেন, কীভাবে ৩৫০ ফুট গর্ত করা হল রাজস্থানের মরু অঞ্চলে। খাড়া গর্ত। নিচে নেমে গিয়ে ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মত একপাশে বেঁকে গেছে। সেই বাঁকের ডগায় পরমাণু বোমা। বোমার সামনে টেলিভিশন ক্যামেরা। গর্তের নিচের দিকটা বালির বস্তা দিয়ে বন্ধ করা হল। তার ওপর মাটি এবং বালি দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া।

মাঝে মাঝে স্লাইডের সাহায্যে দেখালেন বিদ্যুৎবাহী কেবল, পর্যবেক্ষণ-মঞ্চ, টেলিফোনের তার, আবহাওয়া পরিমাপক যন্ত্রাবলী এবং ইত্যাদি।

ডঃ রামান্না বললেন, নির্দিষ্ট সময়ে বিস্ফোরণ তো ঘটান হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল সেটা দেখার কী হবে?

প্রথমত তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত ভীতি। ইনি বলছেন, আপনি এগোন, উনি বলছেন, আপনি এগোন।

কিন্তু একেবারে মিলিটারি তৎপরতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন প্রবীণ বিজ্ঞানী এবং ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের স্বাস্থ্য পদার্থবিজ্ঞান শাখার প্রধান ডঃ অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। মনিটারিং যন্ত্রাবলী নিয়ে দুর্ধর্ষ সেনানায়কের মত তিনি এগিয়ে গেলেন। আশপাশের তেজস্ক্রিয়তা মাপলেন। তারপর আমাদের ডেকে বললেন, চলে আসুন, কোন ভয় নেই।

এবার আমরা গুটিগুটি এগিয়ে গেলাম। বিস্ফোরণস্থলের অনেক কাছাকাছি। না। কোন ভয়ের কারণ ঘটেনি।

পরে হেলিকপটার থেকে দেখেছি, যে জায়গাটায় বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছে, সেখানটায় বড় একটি গর্ত। গর্তের পাশে অনুচ্চ পাহাড়ের মত খানিকটা জায়গা। বিস্ফোরণের ঘাতজনিত বলে ভূগর্ভের খানিকটা অংশ ঠেলে উপরে উঠে আসার দরুনই ওই পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে।

জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, যার বিস্ফোরণ ঘটান হল তার আকার বা আয়তন কী রকম ছিল ?

ডঃ রামান্না ঃ ভেরি স্পেসিফায়েড কোশ্চেন। নো কমেণ্ট।

ডঃ রামান্না বললেন, এই মুহূর্তে বিশদ কিছু বলা সম্ভব নয়। বিস্ফোরণের জায়গাটি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। কারণ, ভূগর্ভে যেখানটায় বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছে বিস্ফোরণে সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গার তাপমাত্রা উঠে যায় প্রায় ১০ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত। ওই তাপে এবং ভূস্তরের চাপে সেখানকার সব কিছুই গলে যাবার কথা। গলন্ত সেই সব ভূ-তাত্ত্বিক বস্তু জমে কঠিন আবরণের মত সেখানে থিতিয়ে থাকবে। সেই আবরণের নিচেকার তেজস্ক্রিয়তা এবং আরও অনেক কিছুর ওপর বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে কিছুটা সময় লাগবে।

প্রশ্ন ঃ তৈরি করতে কত সময় লেগেছে ?

ডঃ রামান্না ঃ পঁচিশ বছর।

অর্থাৎ ডঃ রামান্না পরীক্ষামূলক এই বিস্ফোরণের ব্যাপারটিকে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে স্বীকার করতে রাজী নন।

তাঁর বক্তব্য, পরমাণুবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা এবং মানব কল্যাণে এই বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কিত কাজের ব্যাপারে এ দেশে প্রথম পদক্ষেপ প্রায় পঁচিশ বছরের ঘটনা। সীমিত এই সময়ের মধ্যে দেশকে এ ব্যাপারে স্বনির্ভর করে তোলার জন্যে চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালে ট্রম্বেতে প্রথম পারমাণবিক চুল্লি অপ্সরা চালু করা হয়। পরে সাইরাস, জারলিনা এবং পূর্ণিমা। তৈরি করা হয়েছে একাধিক ভারী জলের কারখানা। তারাপুর এবং রাজস্থানের তাপ

পারমাণবিক চুল্লি। চিকিৎসা এবং কৃষি বিজ্ঞানের জন্যে নানান আইসোটোপ। প্লুটোনিয়াম তৈরি করাই শুধু নয়, অত্যন্ত বিপজ্জনক এই বস্তুটিকে নিয়ে কাজ করার মত যোগ্যতাও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অর্জন করেছেন। এ সব করতে প্রায় পঁচিশটি বছর ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অতিবাহিত করেছেন। এ সমস্তই এখন রুটিনমাফিক কাজ। পারমাণবিক বিস্ফোরণ এই রুটিনেরই একটি অংশ।

কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে এখনও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব কেন?

খানিকটা ক্ষোভ এবং কিছুটা অভিমানের সুরেই ডঃ রামান্না মন্তব্য করলেন: আমরা যখন প্রথম অপ্সরা চুল্লিটি চালু করলাম, অনেকে বললেন, এসব তো বিদেশী জিনিস। আমাদের কৃতিত্ব কোথায়? সাইরাস, জারলিনা—এদের ক্ষেত্রেও এমন ধরনের কথা কানে এসেছে। কিন্তু এবার যা ঘটল, সে ব্যাপারে তাঁরা কী বলবেন? এক, পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রযুক্তি এমন একটি ব্যাপার, যা কোন দেশই অপরকে বলবে না। দুই, এ ধরনের প্রয়াসে যে যথেষ্ট যোগ্যতার প্রয়োজন, বলাই বাহুল্য।

প্রসঙ্গত ডঃ রামান্না বললেন: আরও দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার জন্যে আপনারা অপেক্ষা করুন। এর একটির কাজ নিকটতম ভবিষ্যতে কলকাতার বিধান নগরে শেষ হতে চলেছে—ভেরিয়েবল্ এনার্জি সাইক্লোট্রন। এটি চালু হওয়ার পর পরমাণুবিজ্ঞানে মৌল গবেষণায় ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অভূতপূর্ব সুযোগ পাবেন। অপরটি মাদ্রাজের কল্পক্কমে যে ব্রিডার রিঅ্যাকটার তৈরির কাজ চলছে, সেটি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্রিডার রিঅ্যাকটার তৈরির ব্যাপারে পৃথিবীর কয়েকটি শক্তিশালী দেশ জোর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে তাপপারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে অনেক দেশকে এ ধরনের চুল্লির উপর নির্ভর করতে হবে।

পৃথিবীর কোন কোন দেশ ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জলাধার, কৃত্রিম পোতাশ্রয়, খাল এবং বড়বড় নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্যে চেষ্টা করছে, ডঃ রামান্না সে কথাও উল্লেখ করেন।

ডঃ রামান্না বললেন, সাধারণত টি এনটি-র বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এ যাবৎকাল ভূগর্ভে আমরা গর্ত খুঁড়ে এসেছি। এই বস্তুটি নিয়ে কাজকারবার চালানর সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। বিশেষ করে বড় ধরনের বিস্ফোরণে টি এন টি চাই প্রচুর। আর বেশি টি এন টি নিয়ে কাজ করা মানেই আরও বেশি ঝুঁকি নেওয়া। তাতে খরচও পড়ে বেশি। তুলনায় ওই একই কাজে পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাহায্য নিলে ঝুঁকি এবং খরচ দুই-ই কম পড়বে।

এক

তারাপুর পারমাণবিক চুল্লির জন্যে জ্বালানি 'এনরিচড্ ইউরেনিয়াম' নিয়মিত সরবরাহ করবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এটা একটি প্রচ্ছন্ন ব্যবসায়িক চুক্তি, কোনো করুণা নয়। কিন্তু রাজস্থানের পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত সেই পরীক্ষার পর ব্যাপারটা মোড় নিল অন্যদিকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে শুরু হলো কথার মারপ্যাঁচ নানা রকম টালবাহানা। তাঁরা সরাসরি প্রশ্ন তুললেন এই তো! ভারত মানব-কল্যাণে পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করুক, এই তো আমরা চেয়েছিলাম। তারা বোমা তৈরি করুক তা তো আমরা চাইনি।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা জবাবে বললেন, বোমা বলছেন কেন? আসলে আমরা যা করেছি সেটা তো পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত গবেষণা। এ ধরনের গবেষণা তো মার্কিন দেশেও হয়েছে। হয়েছে সোভিয়েত দেশেও। পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাহায্যে কম খরচে এবং কম সময়ে সেচের জন্যে খাল বা জলাধার তৈরি করা যায়, দরকার হলে ভূস্তরের গভীরতম অঞ্চল থেকে মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ, তাও করা যেতে পারে। এসব যে করা যায় সে কথা তাঁরাও কি স্বীকার করেন নি? ভারতও যদি ওই পথে কিছুটা চেষ্টাচরিত্তির চালায় তাতে আপত্তি কোথায়?

কিন্তু ক্ষমতার কাছে যুক্তির স্থান আর কতটা?

ভারতের পারমাণবিক উদ্যোগের রূপকার স্বর্গত ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। তিনি জানতেন, পৃথিবী থেকে তথাকথিত রাজতান্ত্রিক উপনিবেশবাদ হয়ত একদিন মুছে যাবে। কিন্তু তার পরিবর্তে প্রকট হয়ে দেখা দেবে আর এক ধরনের উপনিবেশবাদ। ইংরেজিতে যাকে বলা চলে "টেকনলজিক্যাল ইম্পিরিয়লিজম" বা প্রযুক্তিতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ। অর্থাৎ প্রযুক্তির দিক থেকে যে দেশ যত বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন হবে, সে দেশ প্রযুক্তির দিক দিয়ে কম ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের ওপর তার স্বার্থপর প্রভাব বিস্তার করবেই।

আর এ কথা ভেবেই ভারত পারমাণবিক উদ্যোগের ব্যাপারে যাতে সর্বাঙ্গীণ আত্মনির্ভরতা লাভ করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রেখে ডঃ ভাবা তাঁর পরিকল্পনা রচনায় হাত দেন। পারমাণবিক জ্বালানি এই পরিকল্পনার একটি বড় রকমের দিক। সমস্যাও।

কারণ ঃ এক, পারমাণবিক জ্বালানি কয়লার মত নয়, যে খনি থেকে তুলে নিয়ে এসে চুল্লিতে ফেলে দিলেন, আর তার গনগনে আঁচে বয়লারের জল ফুটে বাষ্প তৈরি হলো, যার সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটার চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। দুই, পারমাণবিক জ্বালানি হিসেবে এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর

সর্বত্র যে বস্তুটি কাজে লাগান হয় তার নাম ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়ামকে কয়লার মত সরাসরি চুল্লিতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। তিন, ইউরেনিয়ামের কয়েকটি সমস্থানিক রূপ আছে। যাদের বলা হয় আইসোটোপ। কোন পদার্থের আইসোটোপগুলির রাসায়নিক ধর্ম একই ধরনের হয়ে থাকে, তাদের পারমাণবিক ভর শুধু ভিন্নতর। চার, প্রকৃতিতে খনিজ পদার্থ হিসেবে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় তার মধ্যে থাকে দুই রকমের ইউরেনিয়াম আইসোটোপ। ইউরেনিয়াম-২৩৫ এবং ইউরেনিয়াম-২৩৮। পরিমাণের দিক দিয়ে হিসেব করলে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে ইউরেনিয়াম-২৩৮ থাকে ৯৯.৩ শতাংশ। আর ইউরেনিয়াম-২৩৫ থাকে ০.৭ শতাংশ। পাঁচ, তারাপুর পারমাণবিক চুল্লিতে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। চুল্লিগুলি সেখানে এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে, যার জন্যে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করতে হয় 'এনরিচড্ ইউরেনিয়াম' বা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম। তারাপুরে যে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ থাকে প্রায় ২.৪ শতাংশ। বাকিটা ইউরেনিয়াম-২৩৮। ছয়, মুশকিল এই, সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম তৈরির কাজ প্রযুক্তির দিক দিয়ে খুবই জটিল এবং প্রচণ্ড

তারাপুরের 'ফুয়েল বাণ্ডল' এখন নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেক্সই তৈরি করছে

৬১
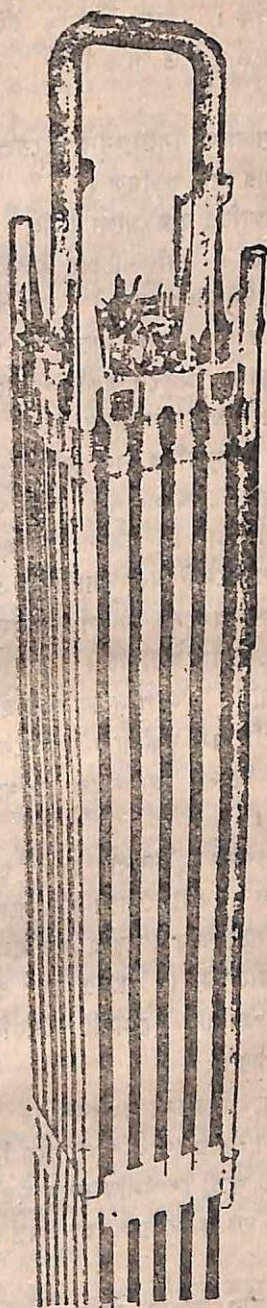
ব্যায়সাপেক্ষ। ফলে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম তৈরির কারখানা এখনও পর্যন্ত আমরা গড়ে তুলতে পারি নি।

*

হায়দ্রাবাদের নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকস-এ যাওয়ার পথে এসব কথাই বার বার আমার মনে পড়ছিল।

জায়গাটির নাম মৌলা আলি। হায়দ্রাবাদ শহর থেকে প্রায় দশ বারো কিলোমিটার দূরে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির এই অঞ্চলটি অনেকটা বন্ধুর। আশ-পাশে ছোটখাটো পাহাড়। তার গায়ে বড় বড় কোয়ার্টজ পাথর। কোনটি ডিম্বাকৃতি। কোনটি থামের মত দাঁড়িয়ে। চিরায়ত ভাস্কর্যের মত। প্রকৃতির হাতে গড়া। অদূরে একটি পাহাড়ের ওপর মসজিদ এবং সমাধি। মৌলা আলি নামে এক মুসলমান সন্তের সমাধি। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সমতল ভূমি। জানুয়ারির স্বচ্ছ রোদে সেখানে ধানের ক্ষেতে সবুজের সমারোহ। পথে পড়ল মিটার গেজ লাইন। আর তার পরই বিরাট এলাকা জুড়ে এক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। গত পনের বছরে যারা এখানকার চেহারাটা পালটে দিয়েছে।

ডিপার্টমেণ্ট অভ্ অ্যাটমিক এনার্জির অন্যান্য সংস্থার মত নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকসের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও দেখলাম খুবই কঠোর।

প্রথমেই সিকিউরিটি। ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে পরিচয় দিতেই জানালেন, একটু বসুন। আপনি যে এসেছেন সেটা আমাদের কোয়ালিটি কনট্রোল ম্যানেজার ডঃ টি এস কৃষ্ণাণকে জানিয়ে দিই। নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকসের কাজকর্ম তিনিই আপনাকে দেখিয়ে দেবেন। সেই রকম নির্দেশই আমরা পেয়েছি।

একেবারে রুটিন ব্যবস্থা। ডঃ কৃষ্ণাণের সঙ্গে আগে থেকেই দিনক্ষণ ঠিক করা ছিল। টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। তারপর নিরাপত্তা অফি-সারের নির্দেশমত গিয়ে হাজির হলাম তাঁর অফিসে।

বিরাট চত্বর। পথের পাশে দাঁড়িয়ে এক একটি ওয়ার্কশপ। বরং বলি পাইলট প্ল্যাণ্ট। কোনটি ইউরেনিয়ামের, কোনটি জারকোনিয়াম অথবা টাই-টেনিয়ামের।

তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ কৃষ্ণাণের উপর কিন্তু মস্ত বড় দায়িত্ব। পারমাণবিক জ্বালানি তৈরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম তৈরি হচ্ছে এখানে। সে সব কাজ শুধু স্পেসিফিকেশন মত করলেই চলবে না, অকল্পনীয় নিখুঁত হতে হবে। ডঃ কৃষ্ণাণের দায়িত্ব সমস্ত কাজ নিখুঁত হচ্ছে কী-না, তার উপর নজর রাখা।

আমার মাথার ভেতর তখন তারাপুর এবং 'এনরিচড ইউরেনিয়াম'। প্রসঙ্গটি তুলতেই ডঃ কৃষ্ণাণ বললেন এ ব্যাপারে আমার মুখে কিছু শোনার চেয়ে

ডঃ রাও-এর কাছ থেকে শুনলেই বরং ভালো, মিঃ কর। ডঃ নিদমার্তি কোনডাল রাও আমাদের চিফ একজিকিউটিভ। আপনি আসছেন তিনি জানেন। প্ল্যাণ্টগুলি ঘুরে দেখার আগে বরং চলুন, তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।

ডঃ রাও-এর কথা আগেই জানতাম। পশ্চিম জার্মানিতে প্যালাডিয়াম, রূপা, সিলিকন এবং সংকর ধাতুর উপর গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট লাভ করেন। পরে পারমাণবিক ধাতুবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হন। কানাডা-ইনডিয়া চুল্লির অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের আবরক নল তাঁরই তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল। ট্রম্বের জারলিনা রিঅ্যাকটারের পারমাণবিক জ্বালানি সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম তৈরি করার ব্যাপারেও তাঁর অবদান অপরিসীম। ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে পারমাণবিক জ্বালানি যেমন, ইউরেনিয়াম, ইউরেনিয়াম অকসাইড, থোরিয়াম, থোরিয়াম অকসাইড বিষয়ক গবেষণা ও তাদের ব্যবহারিক দিক উদ্ভাবন করার ব্যাপারেও ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত তিনি উল্লেখযোগ্য কাজ করে এসেছেন। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে দরকার হয় জারকোনিয়ামের সংকর ধাতু। যার নাম দেওয়া হয়েছে জারকেলয়। নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকসে এই জারকেলয় দিয়ে পারমাণবিক জ্বালানির আধার বিশেষ এক ধরনের নল উৎপাদন করার যাবতীয় পরিকল্পনার মূলেও তিনি। ১৯৭৩ সাল থেকে নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকস-এ এই সব বস্তু নিয়মিত উৎপাদিত হচ্ছে। ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অভ্ সায়েন্সেস, অন্ধ্র প্রদেশ অ্যাকাডেমি অভ্ সায়ান্সেস এবং মহারাষ্ট্র অ্যাকাডেমি অভ্ সায়ান্সের সদস্য ডঃ রাও-কে তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্যে ১৯৬৮ সালে "ন্যাশনাল মেটালার্জিস্ট অ্যাওয়ার্ড" সম্মানিত করা হয়েছিল। ডঃ ভাবা স্বপ্ন দেখেছিলেন, পারমাণবিক উদ্যোগে ভারত আত্ম-নির্ভর হোক। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নিজেদের জ্বালানি নিজেরাই তৈরি করুক। তৈরি করুক পারমাণবিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম। এত ব্যাপক কাজ ট্রম্বেতে বসে সম্ভব করে তোলা যাবে না। যাবে না বলেই পরবর্তীকালে হায়দ্রাবাদের এই মৌলা আলিতে গড়ে তোলা হলো নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকস। ডঃ রাও-এর তত্ত্বাবধানে এখন যা অনেক দিক দিয়েই দেশকে আত্মনির্ভর করে তুলতে সাহায্য করছে।

•

প্রশ্ন ঃ ডঃ রাও, কিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকসে এসে যে কথা আমার প্রথম মনে এসেছে, তা হলো আমাদের তারাপুরের ভবিষ্যৎ কী ? এনরিচড্ ইউরেনিয়াম নিয়ে মার্কিন দেশ টালবাহানা করছে। যদি এমনটি চলে, তাহলে তারাপুরকে কি শেষ পর্যন্ত আপনারা বন্ধ করে দেবেন ?

ডঃ রাও ঃ আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আমার দেওয়া ঠিক হবে না, মিঃ কর। এর উত্তর একমাত্র আমাদের চেয়ারম্যানই দিতে পারেন। এটুকু শুধু

বলতে পারি রাজস্থানের কোটায় আমরা যে দ্বিতীয় পারমাণবিক উৎপাদন কেন্দ্রটি বসিয়েছি তাতে ব্যবহার করা হচ্ছে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম। ওই কেন্দ্রটির দুই নম্বর চুল্লি অল্প দিনের মধ্যেই চালু হবে। এই চুল্লির সম্পূর্ণ জ্বালানি আমরাই সরবরাহ করবো।

প্রশ্ন : তারাপুর পারমাণবিক চুল্লির জন্যে শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি সাহায্য আমাদের নিতে হয়েছিল বিদেশ থেকে। শুধু 'এনরিচড্ ইউরেনিয়ামই নয়, ইউরেনিয়াম জ্বালানির ধাতবনলাধার থেকে অন্যান্য অনেক সরঞ্জামও আমাদের প্রচুর খরচ করে বিদেশ থেকে আনতে হয়েছিল। সেই খরচের ধাক্কাটা একবার ভাবুন।—

ডঃ রাও : বুঝতে পারছি আপনি কি জানতে চান। হ্যাঁ খরচ। অনেক খরচই তখন আমাদের করতে হয়েছিল প্রযুক্তিগত সুযোগ তখন কম ছিল বলে। তবে সে খরচ এখন আমরা অনেক কমিয়ে এনেছি। যেমন ধরুন, তারাপুরে ব্যবহার করা হয় এনরিচড্ ইউরেনিয়ামের অকসাইড—জ্বালানি হিসেবে। এই জ্বালানি এখন আমরা ফিনিসড্ প্রোডাকট্ হিসেবে আনি না। আমরা আনি বিশেষ ধরনের এক যৌগ হিসেবে। যার নাম ইউরেনিয়াম হেকসাফ্লোরাইড। এই ইউরেনিয়াম অবশ্য 'এনরিচড্'। এতে খরচ পড়ে কম। তা ছাড়া পরিবহণ করার সমস্যাও থাকে না। আমাদের এই ফুয়েল কমপ্লেকসে ওই ইউরেনিয়াম হেকসাফ্লোরাইডকে আমরা প্রোসেস করি। তা ছাড়া রিঅ্যাকটারে জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে পুরতে হয় নতুন জ্বালানি। তার জন্যে দরকার জারকেলয়ের তৈরি লম্বা লম্বা নলাধার। যাকে বলা হয় ফুয়েল ক্ল্যাডিং। সেই ক্ল্যাডিংও তৈরি করছি আমরা। এর জন্যে আমাদের আর বিদেশের মুখ চেয়ে থাকতে হবে না। এতেও বৈদেশিক টাকার প্রচুর সাশ্রয় হচ্ছে।

ওঁর নাম দিয়েছেন 'এলিমেণ্ট বাণ্ডলস'। বাণ্ডল বলতে এখানে বোঝায় লম্বা লম্বা নল। জারকেলয়ের তৈরি ওই নলগুলি দেখেছি। যাদের প্রত্যেকটির ভেতরকার ব্যাস প্রায় এক সেণ্টিমিটারের মত। লম্বা চার মিটার। অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে তৈরি এই নলের মধ্যে পর পর পুরে দেওয়া হয় 'এনরিচড্ ইউরেনিয়াম অকসাইডে'র খণ্ড। যাদের বলা হয় 'পেলেটস'। এক একটি দেখতে কতকটা সারিডনের ট্যাবলেটের মত। রঙটি শুধু সাদার বদলে গাঢ় খয়েরি। পর পর ছত্রিশটি নলে প্রথমে ইউরেনিয়ামের ট্যাবলেটগুলি পুরে দেওয়া হয়। তারপর বর্গাকারে তাদের সাজিয়ে তৈরি করা হয় এক একটি 'এলিমেণ্ট বাণ্ডল'। বিশেষ ধরনের ঝালাই ব্যবস্থায় বাণ্ডলের মধ্যে নলগুলি জুড়ে রাখা হয়। বাণ্ডলের উপরে জুড়ে দেওয়া হয় একটি হাতলের মত অংশ। যার সাহায্যে বাণ্ডলটি যথাযথভাবে রিঅ্যাকটারের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়ে থাকে।

তারাপুর চুল্লিতে যে পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহার করা হয়, সংক্ষেপে এই হলো তার প্রস্তুত পদ্ধতি।

ডঃ কৃষ্ণাণ বললেন, এক একটি বাণ্ডলে ছত্রিশটি নল থাকে ঠিকই। কিন্তু প্রত্যেকটি নলে যে একই ধরনের 'এনরিচড্ ইউরেনিয়াম' থাকবে তা কিন্তু নয়। নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়ামে ঘটে পারমাণবিক বিভাজন বা নিউক্লিয়ার ফিশন। আর তার ফলে নির্গত হয় উত্তাপ শক্তি। এই উত্তাপেই জলকে বাষ্প করে সেই বাষ্পের চাপে টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটার চালানো হয়। মজা হলো, বাণ্ডলের বাইরের দিকে যে নল থাকে তাদের মধ্যেকার ইউরেনিয়াম যে হারে পারমাণবিক বিক্রিয়া চলে, ভেতরের নলগুলিতে সেই হারে চলে না। এই বৈষম্যের কথা ভেবেই বিভিন্ন নলে বিভিন্ন মাত্রার ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। বাইশটি নলের পেলেটে ইউরেনিয়াম-২৩৫ থেকে ২·৬৬ শতাংশ, এগারটিতে ২·১ শতাংশ এবং তিনটিতে মাত্র ১·৬ শতাংশ ইউরেনিয়াম-২৩৫। অবশিষ্ট ইউরেনিয়াম-২৩৮।

প্রযুক্তির দিক দিয়ে এ ধরনের 'বাণ্ডল এলিমেণ্টস' তৈরি করায় ঝঞ্ঝাট বেশী। তার চেয়ে কোটায় প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা জন্যে যে বাণ্ডল তৈরি করতে হয় তাতে ঝঞ্ঝাট কম।

হ্যাঁ, শুধু এনরিচড্ ইউরেনিয়ামের জন্যেই তারাপুর আমাদের কাছে বড় একটি মাথাব্যথা। নইলে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার ব্যাপারে নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকসের বিজ্ঞানী এবং কারিগররা যে ভূমিকা নিয়েছে সেটা বড় রকমের একটি চ্যালেঞ্জ। বলা বাহুল্য সে চ্যালেঞ্জে তাঁরা সফলও হয়েছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁদের সেই চমকপ্রদ কাজের বিবরণ দেব।

দুই

'পারমাণবিক শক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগান যখন সম্ভব হবে, ধরা যাক আজ থেকে বছর কুড়ির মধ্যে, তখন ওই কাজের বিশেষজ্ঞ খোঁজার জন্যে ভারতকে আর বিদেশের দিকে চেয়ে থাকার প্রয়োজন হবে না, কারণ তাঁদের তখন আমরা হাতের কাছেই পেয়ে যাব।' একে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়া কী বলব? না শুধু মুখের কথা নয়। হিরোশিমায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে। আর তারও প্রায় আঠার মাস আগে বাঙ্গালোর বসে লিখিতভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি করেছিলেন ডঃ হোমী জাহাঙ্গীর ভাবা। অমন বিস্ফোরণ শক্তির কথা তখন তো অকল্পনীয়! পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহল শুধু এইটুকু খবর রাখতেন, পরমাণুর বিভাজন ঘটানো যায়। আর এই ঘটনা সম্পর্কে যৎসামান্য

যে খবরটুকু জানা গিয়েছিল তার উপর নির্ভর করেই অত বড় এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ডঃ ভাবা।

১৯৪৮ সালে তৈরি হলো ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশন। ১৯৫৪ সালে ডিপার্টমেণ্ট অব অ্যাটমিক এনার্জি। ইতিমধ্যে ১৯৫৩ সালে ট্রম্বেতে থোরিয়াম প্ল্যাণ্ট বসানো হয়ে গেছে। বসানো হয়ে গেছে এক মেগাওয়াটের গবেষণামূলক পারমাণবিক চুল্লী 'অপ্সরা'। ক্রমে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারটা সামনে রেখে গড়ে উঠল একে একে আনুষঙ্গিক উদ্যোগগুলি। হায়দ্রাবাদের নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকস যাদের অন্যতম। ডঃ ভাবার ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থক রূপায়ন।

যেকথা গত সপ্তাহের লেখায় উল্লেখ করেছি—ফুয়েল—নিউক্লিয়ার ফুয়েল! পারমাণবিক জ্বালানি চাই। এখুনিই চাই। নইলে কতদিন আমরা বিশেষ এই বস্তুটির জন্যে খেলার পুতুল হয়ে রইব মার্কিন দেশ, কানাডা অথবা অন্য কোন বিদেশী শক্তির কাছে। তারপর পারমাণবিক চুল্লীর জন্যে দরকার এনরিচড্ ইউরেনিয়াম। এনরিচড্ ইউরেনিয়াম সমস্যা দূর করার জন্যে প্রযুক্তির হেরফের ঘটিয়ে কোটায় তৈরি করা হলো বিশেষ ব্যবস্থার পারমাণবিক চুল্লী। তাতে ব্যবহার করার কথা প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম।

কথাটা মনে পড়তেই নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকসের অধিকর্তা ডঃ কোনডল রাওকে জিজ্ঞেস করলাম, বলুন ডঃ রাও, খুব বেশী না হলেও জানি প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম আমাদের দেশেও আছে। বিহারের যদুগোড়ায়। একথাও জানি, পারমাণবিক জ্বলানি তো কয়লা নয়, যে খনি থেকে তুলে এনে সরাসরি চুল্লীতে ঢেলে দেবেন? অত্যন্ত জটিল রাসায়নিক পদ্ধতিতে ভূতাত্ত্বিক আবর্জনা থেকে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামকে মুক্ত করতে হবে। সেই ইউরেনিয়ামকে পারমাণবিক চুল্লীতে ব্যবহার মত উপযুক্ত করে তোলা সে-ও খুব সহজ কাজ নয়। আমাদের কুশলীরা এ সব কাজে কি পুরোপুরি আত্মনির্ভর হতে পেরেছেন?

প্রশ্ন শুনে মুহূর্তে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ডঃ রাও। তাঁর সারা মুখে ফুটে উঠল সাফল্যের আবেগ চিহ্ন।

বললেন, জানি। এ প্রশ্ন আপনার একার শুধু নয়, দেশের সমস্ত মানুষের। আর এ ক্ষেত্রে আমার উত্তর একটিই: দেশের খনি থেকে ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করা থেকে তাকে পারমাণবিক চুল্লীতে ব্যবহার করার মত উপযোগী করে তোলা—সবকিছুই এখন করছে আমাদের কুশলীরা, মিঃ কর। ডঃ কৃষ্ণাণ সব আপনাকে দেখিয়ে দেবেন।

ডঃ কৃষ্ণাণের সঙ্গে ফুয়েল প্রসেসিং প্ল্যাণ্টে ঢুকতেই সেখানকার পরিবেশটি কেমন ভেজা ভেজা মনে হলো। সর্বত্র একটা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। বিরাট বাড়ি। ছাদই প্রায় চারতলার মত উঁচুতে। বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই চোখে পড়ল

এক পাশে বড় ড্রাম।

এই যে ড্রাম দেখছেন, বললেন ডঃ কৃষ্ণাণ, এই ড্রামে করেই যদুগোড়া থেকে আমরা নিয়ে আসি ইউরেনিয়াম।

কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠলাম। বললাম, তাহলে আমরা কি এখন তেজষ্ক্রিয় পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে?

আমার কথায় ডঃ কৃষ্ণাণ হেসে ফেললেন। বললেন, ভয় পাবার কারণ নেই। শারীরিক ক্ষতি হয় তেমন বেশি তেজষ্ক্রিয়তা এখানে নেই।

দেখলাম। যদুগোড়ার কারখানা থেকে আকরিক ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করে সেখানেই প্রথমে তাকে শোধন করে নেওয়া হয়। খনিতে প্রথমে যা পাওয়া যায়, সে তো পাথর। তার মধ্যে ইউরেনিয়ামের পরিমাণই বা কতটুকু। সেই পাথর থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত পদার্থ সেখানেই পৃথক করে নিয়ে প্রথমে তৈরি করা হয় এক ধরনের যৌগ। নাম ম্যাগনেসিয়াম ডাই-ইউরেনেট। এই বস্তুটি শুকিয়ে খণ্ড খণ্ড করে নেওয়া হয়। হলদে রঙ বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে "ইয়োলো কেক"। দেখলাম ড্রামের সেই ইয়োলো কেক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রায় তিনতলা উঁচু কাঠামোর উপর বসানো একটি আধারে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন বিক্রিয়াকক্ষে। "ইয়োলো কেক"কে প্রথমে দ্রবীভূত করা হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিডে। তারপর তাকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ডাই-ইউরেনেটে। অতঃপর "ক্যালসিনেশন"। অর্থাৎ উচ্চতর তাপমাত্রায় গরম করে রাসায়নিক রূপান্তর ঘটানো। এখানে তৈরি হয় ইউরেনিয়াম ট্রাই-অকসাইড। পরে একে বিজারিত করে পরিণত করা হয় ইউরেনিয়াম ডাই-অকসাইড-এর চূর্ণ। যার রঙ গাঢ় খয়েরী।

ইউরেনিয়াম ডাই-অকসাইডের এই চূর্ণকে "পেলেট"-এ রূপান্তরিত করা হচ্ছে আর এক অংশে। পেলেটগুলি দেখতে প্রায় এক সেন্টিমিটার ব্যাসের বড়ির মত। পুরু প্রায় পাঁচ মিলিমিটার। শক্ত এবং সংবদ্ধ করার জন্যে পেলেটগুলিকে এর পর হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিবেশে প্রায় ১৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করে নেওয়া হয়। তারপর তাদের চারপাশের তল ঘষে উপযুক্ত জ্যামিতিক আকৃতিতে নিয়ে এসে পুরে নেওয়া হয় জারক্যালয়ের তৈরি আচ্ছাদক নলের মধ্যে।

ডঃ কৃষ্ণাণ বললেন, এখানে কয়েকটি দিকের ওপর আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। দেখতে হবে আচ্ছাদক নলের মধ্যে যেন এতটুকু জলীয় বাষ্প না থাকে। এতটুকু জল থাকলে জ্বালানি ঠিকমত কাজ করবে না। পেলেটগুলি নলের মধ্যে পুরে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নলের মুখদুটি জারক্যালয়ের ঢাকনা দিয়ে ঝালাই করে নেওয়া হয়। নলগুলি যাতে পারমাণবিক চুল্লির মধ্যে থাকার সময় উচ্চচাপ সহ্য করতে পারে, তার জন্যে তাদের গায়ে ঝালাই করে জড়িয়ে দেওয়া

হয় জারক্যালয়ের তৈরি তার। পরে কয়েকটি নলকে একসঙ্গে জড়িয়ে তৈরি করা হয় ফুয়েল "বাণ্ডল"।

প্রশ্ন ঃ এক একটি বাণ্ডলের ওজন কত ?

উত্তর ঃ সেটা নির্ভর করছে, কী ধরনের চুল্লির জন্যে আপনি ফুয়েল বাণ্ডল তৈরি করতে চান, তার ওপর। রাজস্থানের কোটায় যে পারমাণবিক চুল্লি কাজ করছে তাকে বলা হয় "ক্যানাড্যু টাইপ রিঅ্যাকটর"। দেখতেই পাচ্ছেন, এ ধরনের রিঅ্যাকটরে যে জ্বালানি-আচ্ছাদক নল ব্যবহার করা হচ্ছে দৈর্ঘ্যে তা অনেক ছোট। ক্যানাড্যু রিঅ্যাকটারে এক একটি বাণ্ডলে থাকে ১৫.২ কিলোগ্রাম প্রাকৃতিক ইইরেনিয়ামের অক্সাইড। আর তার মোট নলগুলির জন্যে দরকার হয় ১.৫ কিলোগ্রাম জারক্যালয়। তুলনায় তারাপুরের পারমাণবিক চুল্লিতে জ্বালানি-আচ্ছাদক যে নল ব্যবহার করা হয় তা লম্বায় চার মিটার। তারাপুর রিঅ্যাকটরের এক একটি বাণ্ডলে থাকে ১৬০ কিলোগ্রাম "এনরিচড্" ইউরেনিয়ামের অকসাইড। আর জারক্যালয় থাকে ৩৪-২ কিলোগ্রাম।

প্রশ্ন ঃ তা হলে পারমাণবিক জ্বালানির ব্যাপারে নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকসের ভূমিকা কী ধরনের ?

ডঃ রাও-এর উত্তর ঃ বিদেশ থেকে এনরিচড্ ইউরেনিয়ামের যে হেকসাফ্লু-ওরাইড আসছে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে তাকে এনরিচড্ ইউরেনিয়ামের ডাইঅসাইডে রূপান্তরিত করছি। এবং তারপর জারক্যালয় নলে তার পেলেট পুরে তারাপুরের রিঅ্যাকটারে ব্যবহার করার জন্যে পাঠাচ্ছি। রাজস্থানের দুই নম্বর চুল্লি চালু হবে খুব কম দিনের মধ্যে। তার জন্যে দরকার প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের ডাই-অকসাইড। তার সবটাই আমরা সরবরাহ করব। কলপক্কমে তৈরি হচ্ছে পারমাণবিক চুল্লি। সেখানেও জ্বালানি যাবে এখান থেকে। ভবিষ্যতে দেশে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্যে যেখানেই 'ক্যানাড্যু' ধরনের রিঅ্যাকটার বসানো হবে, সেখানে যদুগোড়ার প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামকে আমরা কাজে লাগানর পরিকল্পনা নিয়েছি। এ ব্যাপারে আমরা শতকরা একশ' ভাগ আত্মনির্ভর।

শুধু জ্বালানি নয়, পারামাণবিক চুল্লি থেকে শুরু করে ইউরেনিয়াম পেলেটের আবরক নল, নলগুলি শক্ত রাখার তার, চুল্লিকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে শীতক-নল যার ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা জল (রাজস্থান রিঅ্যাকটারের ক্ষেত্রে ভারী-জল) প্রবাহিত করা হয়, অথবা জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করা হবে যে নলের ভেতর দিয়ে সেই নল—এ সব তৈরির জন্যে দরকার জারক্যালয় নামে এক ধরনের সংকর ধাতু। যার প্রধান উপাদান জারকোনিয়াম। আর সেই জারকোনিয়ামের মধ্যে মেশান থাকে যৎসামান্য টিন, লোহা, ক্রোমিয়াম এবং নিকেল। দেশের প্রয়োজনীয় সেই জারকোনিয়ামও তৈরি হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকস-এ।

কেরালার সমুদ্রবেলায় পাওয়া যায় বিশেষ এক ধরনের বালি। যার রাসায়নিক নাম জারকোনিয়াম সিলিকেট। এই বালির মধ্যে থাকে শতকরা ৬৫ ভাগ জারকোনিয়াম অকসাইড এবং ১.৫ ভাগ হ্যাফনিয়াম নামে আর এক ধরনের ধাতু।

ডঃ কৃষ্ণাণ বললেন, মিঃ কর এই হ্যাফনিয়াম হলো মারাত্মক ধাতু। সামান্যতম হ্যাফনিয়াম মিশে থাকলেও সেই জারকোনিয়াম দিয়ে পারমাণবিক সাজসরঞ্জাম তৈরি করে কোন লাভ হয় না। সুখের কথা হ্যাফনিয়ামকে মুক্ত করে নিউক্লিয়ার গ্রেড জারকোনিয়াম অকসাইড তৈরি করার মত যোগ্যতা আমরা অর্জন করেছি।

দেখলাম জারকন-বালি থেকে বিমুক্ত জারকোনিয়াম অকসাইড। তা থেকে তেরি করেছেন এঁরা জারকোনিয়াম স্পঞ্জ। অবশেষে জারক্যালয়ের পিণ্ড।

বিশুদ্ধতম ধাতু সংগ্রহ করা, যে কোন ধাতুবিজ্ঞানীই স্বীকার করবেন, খুবই জটিল এবং কতকটা যেন অসাধ্য সাধন। দেখলাম এখানকার ধাতুবিজ্ঞানীরা কিন্তু সে ব্যাপারে বড় রকম যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ওঁরা তৈরি করেছেন ক্যাপাসিটার তৈরি করার কত উন্নত মানের ট্যানটেলিয়াম অ্যানোড, এক মিলিমিটারের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ দৈর্ঘ্য পরিমাপের জারকোনিয়াম ধাতুচূর্ণ, ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ব্যবহার করার মত উন্নতমানের বস্তুসামগ্রী, যেমন, অ্যান্টিমনি, আরসেনিক, বিসমাথ, বোরোনট্রাইব্রোমাইড, ক্যাডমিয়াম, গেলিয়াম, ইনডিয়াম, সীসে, সোনা, সেলেনিয়াম, দস্তা, ফসফরাস অকসিক্লোরায়েড প্রভৃতি। বলাবাহুল্য, বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে এদের পরিমাপ ৯৯.৯৯৯ শতাংশ।

ট্যানটেনিয়াম ওজন অনুপাতে প্রচণ্ড শক্ত। তাছাড়া এতে মরচেও পড়ে না। এর জন্যে ট্যানটেনিয়াম এবং তার সংকর ধাতুর চাহিদাও বাড়ছে। বাড়ছে বিমান শিল্পে, মহাকাশগবেষণার সাজসরঞ্জাম তৈরির ব্যাপারে এবং নানা রকম রাসায়নিক শিল্পে। ১৯৭৩ নাগাদ এই প্রতিষ্ঠান বছরে ট্যানটেনিয়াম উৎপাদন করত সাত টনের মত। অদূর ভবিষ্যতে এই পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে বছরে ৩০০ থেকে ৫০০ টন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান এই ধাতুটি যাতে সস্তায় নিষ্কাশন করা যায় এখানকার ধাতুবিজ্ঞানীরা তা নিয়েও গবেষণা করছেন।

নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকস-এ বসানো হয়েছে, ভারতের বৃহত্তম হাইড্রলিক একসট্রিউশন প্রেস,। ছাদের নিচে অতিকায় সেই যন্ত্র যেন বিশ্বকর্মা। যার ওজন ৩১৫০ টন। স্টেইনলেস স্টিল তাপসহনকারী ইস্পাত এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যালয় স্টিলের চাদরকে নানা আকার এবং আয়তনে জুড়ে দিচ্ছে এই প্রেস। তৈরি করছে 'সিমলেস' নল; অর্থাৎ ধাতব চাদরকে জুড়ে এমনভাবে নল তৈরি করছে, যা দেখলে ধরাই যায় না জোড়টি আসলে পড়েছে কোথায়।

ডঃ কৃষ্ণাণ প্রেসটির দিকে চেয়ে বললেন, এই যন্ত্রের সাহায্যে ১২ মিলিমিটার

থেকে ১৫০ মিলিমিটার ব্যাসের সিমলেস স্টেইনলেস স্টিলের নল তৈরি করছি আমরা। এক্ষেত্রে আমাদের উৎপাদনের লক্ষ্য ২০০০ টন। হয়ত সেটা ৪০০০ টনেও আমরা বাড়িয়ে তুলতে পারবো।

প্রশ্ন করেছিলাম ডঃ রাও-কে, আপনাদের লক্ষ্য ছিল পারমাণবিক জ্বালানি এবং তার আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম তৈরি করা। কিন্তু এখন তো দেখছি তার বাইরেও আপনারা বিচরণ করছেন। কাজকর্ম এভাবে বিস্তৃত করলে আপনার কি মনে হয় না, তাতে করে আপনাদের প্রতিষ্ঠান মাথাভারী হয়ে দাঁড়াবে?

ডঃ রাও ঃ খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। আমার উত্তর ঃ আমাদের মূল লক্ষ্য ঠিকই আছে। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, ইউরেনিয়াম অথবা পারমাণবিক ধাতু, যেমন জারকোনিয়াম—এদের উপর কাজ করাই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু তা করতে গিয়ে—এই ধরুন, আমরা ইনডিয়াম, ট্যান্টেলাম, টিন প্রভৃতি ধাতুও কিছুটা পেয়ে যাচ্ছি। এদের গুরুত্ব খুব বেশী। তাই আমরা ভাবলাম, ভাল বিশোধনের ব্যবস্থা যখন আমাদের আছে এবং অন্যান্য অতিরিক্ত কাজের জন্যে যখন তাকে ব্যবহার করা যায়, তা হলে তাদের ব্যবহার করলে মন্দ কি? এই ধরুন, আমাদের পাশেই রয়েছে ইলেকট্রনিক করপোরেশন অভ্ ইনডিয়া লিমিটেড। তাদের ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতির জন্যে দরকার ইনডিয়াম। আমরা সরবরাহ করছি। এই বস্তুটি আগে আমাদের প্রচুর পয়সা খরচ করে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো। এখন নিজেদের চাহিদা মিটিয়েও আমরা রপ্তানি করছি পশ্চিম জার্মানি এবং জাপানের মত দেশে। আপাতত জাপানই আমাদের কাছ থেকে চার লাখ টাকার মত ইনডিয়াম কিনছে। যেমন ধরুন, বিশুদ্ধতম সোনার ব্যাপারটা। আন্তর্জাতিক মানের বিশুদ্ধ সোনা উৎপাদন করে, বরং বলি শোধন করে পশ্চিম জার্মানির 'ডেগুসা' কোম্পানি। এক সময়ে বিশুদ্ধতম সোনার জন্যে (ইলেকট্রনিকস শিল্পে প্রয়োজন) ওই কোম্পানির উপর আমাদের নির্ভর করতে হতো। এখন আমরা এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর।

ডঃ রাও বলে চললেন, দেখুন বিরাট এই হাইড্রলিক প্রেস। পারমাণবিক উদ্যোগের জন্যে আর কতটুকু সময় একে আমরা ব্যস্ত রাখি? তাই ঠিক করা হলো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্যে এর সাহায্যে তো সিমলেস টিউব তৈরি করা যেতে পারে। আমাদের তেল প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের দরকার এ ধরনের টিউব। এই টিউব তাদের বিদেশ থেকে আনতে হয়। এ বছর মার্চ মাস থেকে তাদের জন্যে সিমলেস টিউব তৈরি করায় আমরা হাত দিয়েছি। এ ধরনের ৩০০০ টন টিউবের অর্ডারও তারা দিয়েছে। এ ছাড়া আরও একটি মূল্যবান জিনিস হলো এক ধরনের বলবিয়ারিং। ইংরেজিতে যাকে বলে পাইপটাইপ বলবিয়ারিং। এই প্রথম ওই একসট্রিউশন প্রেসের সাহায্যে ভারতে ওই ধরনের বলবিয়ারিং তৈরির কাজ শুরু হয়েছে এখানে। আমাদের লক্ষ্য, বছরে ২১০০০ টনের মত

পাইপটাইপ বলবিয়ারিং। অবশ্য পরিকল্পনা কমিশনের মতে এর চাহিদা নাকি আরও বেশী।

প্রশ্ন ঃ পারমাণবিক জ্বালানি নিয়ে আপনাদের কারবার। এখানকার পরিবেশে তেজস্ক্রিয়তা যাতে না বাড়ে, সেদিকে কতটা লক্ষ্য রেখেছেন আপনারা?

উত্তর ঃ গ্যাসীয় জঞ্জাল আমরা উঁচু চিমনি মারফৎ ঊর্ধ্বাকাশের বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছি। কঠিন জঞ্জালকে শোধন করে মাটির গভীরে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে। ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের হেলথ ফিজিকস ডিভিশনের সহযোগিতায় এখানকার পরিবেশকে তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে মুক্ত রাখার সব রকম চেষ্টাই আমরা করছি।

প্রশ্ন ঃ এ ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্যে আপনারা হায়দ্রাবাদকে বেছে নিলেন কেন?

উত্তর ঃ এক, এমন প্রতিষ্ঠান নিরাপত্তার জন্যে দেশের অভ্যন্তরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেদিক দিয়ে হায়দ্রাবাদের ভৌগোলিক অবস্থান আদর্শস্থানীয়। দুই, এখানকার বাতাস অনেক পরিষ্কার। তিন, অন্ধ্র সরকার এখানে জমি দিয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রয়োজনীয় জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছেন।

নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকস থেকে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। তখন সেখানে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় শিফটের কাজ। পথের পাশে এক একটি প্ল্যাণ্ট। টাইটেনিয়াম প্ল্যাণ্ট, হ্যাফনিয়াম প্ল্যাণ্ট, জারক্যালই প্ল্যাণ্ট ইত্যাদি। পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটি ট্রাক। ড্রামে করে যদুগোড়ার ম্যাগনেশিয়াম ডাই-ইউরেনেট বয়ে নিয়ে চলেছে।

কমপ্লেকসের বাইরে যখন এলাম, তখন মনের পটে ভেসে উঠেছে একটি মাত্র মুখ। ভাবা। আর মনে পড়ল তাঁর কথা ঃ পারমাণবিক…কাজের বিশেষজ্ঞ খোঁজার জন্যে ভারতকে আর বিদেশের দিকে চেয়ে থাকার প্রয়োজন হবে না।

নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকস তাঁর সেই ভবিষ্যদবাণীই সার্থক করে তুলেছে।

বিতর্কিত প্রসঙ্গ। পারমাণবিক শক্তির ব্যাপার নানা জনের নানা মত। এ নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে প্রচুর। এখনও বইছে। কেউ বলছেন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পারমাণবিক শক্তি মোটেই লাভজনক নয়। কারো মত, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে পৃথিবীর মানুষ, মায় তাবৎ জীব-জগৎকে হয়ত আমরা অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেব। ইদানীং আবার নতুন একটি রব উঠেছে। কেউ কেউ বলছেন, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করুন, ভাল কথা। কিন্তু ওই শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে পারমাণবিক চুল্লিতে তৈরি হয় প্রচুর প্লুটোনিয়াম। এই প্লুটোনিয়াম শক্ত হাতে সংরক্ষিত করার মত কতটা ব্যবস্থা করেছেন আপনারা? কতটা সমর্থ আপনাদের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, যার দ্বারা এই প্লুটোনিয়াম সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব? যদি এমন হয়, ধরুন ওই প্লুটোনিয়াম কেউ চুরি করল। চুরির পর গিয়ে পড়ল সন্ত্রাসবাদীদের হাতে। তখন ওই প্লুটোনিয়াম দিয়ে তারা তো খুদে খুদে পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে পারে? তৈরি করে সারা পৃথিবী জুড়ে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করতে পারে।

'প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। তবু বলা নায় গত কয়েক বছরে পারমাণবিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যতটা উন্নতি হয়েছে সেকথা ভাবলে অনেকেরই মনে হবে এ ধরনের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।' এ মন্তব্য ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের প্রাক্তন ডাইরেকটর এবং ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের চেয়ারম্যান ডঃ রাজা রামান্নার।

ডঃ রামান্নার বক্তব্য, পারমাণবিক শক্তি এখন তার জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে উপনীত। প্রথম পর্যায়ে তাকে আবিষ্কার করা হল এবং সেই সঙ্গে চলল গবেষণা। কী করে প্রকৃতির এই অমিত শক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগান যায়, তারই গবেষণা। দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হল পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনকে বাস্তবায়িত করার জন্যে যে ধরনের প্রযুক্তির প্রয়োজন তার উদ্ভাবনার প্রস্তুতি। চেষ্টা চলল এসব কাজ করতে গিয়ে যাতে না খরচের বহর বেড়ে যায় এবং বিকিরণজনিত বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়। এখন তৃতীয় পর্যায়ে একমাত্র লক্ষ্য, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় শক্তি উৎপাদনের এই বিশেষ অধ্যায়টিকে যাতে টিঁকিয়ে রাখা যায়, সে দিকটা খতিয়ে দেখা। আর সেই সঙ্গে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখা পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে পৃথিবীর পরিবেশ যাতে না জীবজগতের কাছে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

ডঃ রামান্না বলেন, 'জীবনের দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে আমি পারমাণবিক গবেষণা এবং পারমাণবিক সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করে আসছি। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই আমি বলতে চাই, দিন দিন

বিদ্যুৎ সমস্যা যেভাবে প্রকট হচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে পারমাণবিক শক্তি ছাড়া এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রকৃতির আর কোন শক্তি-উৎসের ওপর আমাদের নির্ভর করা সম্ভব নয়। অন্তত আগামী পঁচিশ বছর অথবা তারও কিছু বেশী, পারমাণবিক শক্তির সাহায্যেই আমাদের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে হবে। প্রসঙ্গত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কথা উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন, যে মননশীলতা আচার্য জগদীশচন্দ্রকে ভারতে আধুনিক গবেষণা প্রচলন করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেই একই মননশীলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমিও পারমাণবিক শক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাই।

*

শক্তির প্রচলিত উৎসগুলি সম্পর্কে ডঃ রামান্নার বিশ্লেষণ ঃ ভারতে শক্তির চাহিদা মেটানর জন্যে প্রধানত আমরা কাজে লাগাই তেল, জলশক্তি, কয়লা এবং পারমাণবিক বিভাজন। প্রথমে তেলের কথা ধরুন। আমাদের সংস্থান অনুযায়ী হিসেব করলে দেখা যায় তেল পুড়িয়ে আমরা শক্তি উৎপাদন করি এক শতাংশ মাত্র। আর এই এক শতাংশের জন্যেই যে পরিমাণ তেল খরচ হয় তার মোটা একটি অংশ আমাদের আমদানি করতে হচ্ছে বিদেশ থেকে।

এটা এক দিক। যানবাহনের জন্যে দেশে পেট্রোলিয়ামের চাহিদা বেড়েছে। আরও বাড়বে। এ ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়ামের কোন সার্থক বিকল্প নেই। সার এবং রাসায়নিক শিল্পের জন্যেও প্রচুর পেট্রোলিয়াম দরকার। অথচ পেট্রোলিয়ামের যা যোগান, চাহিদা অনুযায়ী তাতে ঘাটতি মেটান শক্ত।

বিভিন্ন সমস্যার কথার চিন্তা করলে বলতে হবে জলশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেক দিক দিয়েই আদর্শস্থানীয়। যেমন, এর জন্যে যে ধরনের প্রযুক্তির প্রয়োজন সেই প্রযুক্তিতে কোন জটিলতা নেই। রক্ষণাবেক্ষণের কাজে কোন জটিলতা নেই। জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র পরিবেশকে দূষিত করে না। নেই কোন জ্বালানির খরচ। খরচ বলতে একবার তৈরি করতেই যা। তারপর প্রায় চিরস্থায়ী ব্যাপার। কেন্দ্রীয় জল এবং শক্তি কমিশন ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ এই সাত বছর সমীক্ষা চালিয়ে হিসেব করেন, ভারতে জলশক্তিকে কাজে লাগিয়ে একচল্লিশ হাজার মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু সেই উৎপাদনকে কার্যকর করে তোলায় বাধাও আছে অনেক। যেমন, দেশে অনেক জায়গা আছে যেখানে জলাধার তৈরি করে অথবা জলপথের গতিমুখে বাঁধ সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়ত সম্ভব। মুশকিল এই, সে সব জায়গা এত দুর্গম যে, বাঁধ বা জলাধার তৈরি করতে গেলে যে সব সাজ-সরঞ্জাম এবং রসদ দরকার তাদের সেখানে বয়ে নিয়ে যাওয়াই কঠিন। খরচও বেশি। তাছাড়া, জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র না হয় তৈরি হল কিন্তু সেখানে কাজ চালান আরও দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রত্যন্ত এবং দুর্গম অঞ্চল থেকে তার খাটিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা,

প্রাকৃতিক দুর্যোগে একবার যদি পরিবহণ ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে তাকে মেরামত করা দুঃসাধ্যও যেমন, ব্যয় সাপেক্ষও তেমনি। বলা বাহুল্য এসব বাধার দরুন দেশে মোট একচল্লিশ হাজার মেগাওয়াটের মত জলবিদ্যুতের সংস্থান থাকা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত তার শতকরা ষোল ভাগ কাজে লাগান সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমানে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ৩৮ ভাগ জলবিদ্যুৎ।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করতে খরচ পড়ে কত? সেটা নির্ভর করে কোথায় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বসছে তার ওপর। যেমন কয়নায় যে প্রকল্পটি বসেছে সেখানে প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে প্রাথমিক খরচ পড়েছে ১৯০০ টাকা। চিবরোয় এই খরচ দাঁড়িয়েছে প্রতি কিলোওয়াটে ২৮০০ টাকা। এবং দেহার জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র বসাতে গিয়ে প্রতি কিলোওয়াটে খরচ হয়েছে ৪৯০০ টাকা। অর্থাৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা যত বেশী হবে, তাকে তৈরি করতেও খরচ পড়বে তত বেশী। আবার যে জায়গায় ওই কেন্দ্র বসবে সে জায়গাটি যদি দুর্গম অঞ্চলে অবস্থান করে এই খরচ যাবে আরও বেড়ে।

এরপর আছে সময়ের ব্যাপারটা। উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করার সময়। যত সরলই হোক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে সময় লাগে অনেক। যেমন ধরুন, কয়না এবং ইদিক্কি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে সময় লেগেছিল নয় বছর এবং দেহার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে এগার বছর। এসব দিক চিন্তা করলে কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রকল্প গড়ে তোলা অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। লাভজনক হয় না।

কয়লা। হ্যাঁ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়লা আছে প্রচুর। অনুমান আট হাজার কোটি টন। এর মধ্যে একুশ হাজার কোটি টনের সঞ্চয় 'প্রমাণিত' হয়েছে। সঞ্চয়ের শতকরা আশি ভাগ কয়লায় ছাই-এর পরিমাণই প্রায় কুড়ি শতাংশের মত। ভারতে বছরে এখন কয়লার উৎপাদন হয় নয় কোটি টন। এই কয়লার এক-তৃতীয়াংশ আমরা খরচ করি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে। দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫৮ শতাংশই এই বিদ্যুৎ।

মুশকিল এই, দেশের অর্ধেক পরিমাণেরও বেশী কয়লা পড়ে রয়েছে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের কয়েকটি অঞ্চলে। অবশিষ্ট কয়লা খনিগুলি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র। কয়লাখনির কাছাকাছি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বসালে খরচ হয় কম। কিন্তু খনি থেকে দূরে কয়লা বয়ে নিয়ে গিয়ে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হয় এই খরচ অনেক বেড়ে যায়। নিয়মিত শুধু কয়লা পরিবহণের জন্যেই যে খরচ পড়ে শেষ পর্যন্ত তার চাপ এসে পড়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ওপর। এছাড়া খনি থেকে কয়লা তোলা, তাকে পরিষ্কার করে জ্বালানি হিসেবে প্রস্তুত করা, তার জন্যে প্রযুক্তিগত খরচ এবং অন্যান্য ব্যয়ও যথেষ্ট। যেমন ধরুন সিংগ্রলি কয়লাখনি থেকে ওবরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূরত্ব

পঞ্চাশ কিলোমিটার। সিংগ্রলি থেকে সেখানে কয়লা বয়ে নিয়ে গিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে কিলোওয়াট প্রতি খরচ হয় পাঁচশো টাকা। এই হিসেবটির ওপর নির্ভর করে বলা যায় কোন কয়লা খনি থেকে এক হাজার কিলোমিটার দূরে কয়লা বয়ে নিয়ে গিয়ে যদি তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হয়, সেক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে ব্যয় হবে এক হাজার টাকার মত। এদিক দিয়ে চিন্তা করলে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রকে নিশ্চয় কেউ ব্যয়বহুল বলবেন না। বস্তুত কোন কোন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালাতে গিয়ে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয়েছে তা তারাপুর এবং রাজস্থানের পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের উৎপাদন খরচ থেকে অনেক বেশী।

সাম্প্রতিক খবর, ভারতে এ পর্যন্ত বাহান্ন হাজার টন ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। আর থোরিয়ামের সন্ধান মিলেছে তিন লক্ষ কুড়ি হাজার টন। তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশে ইউরেনিয়ামের সঞ্চয় অবশ্য কম। কিন্তু শক্তি উৎপাদনের দিক দিয়ে হিসেব করলে এই সঞ্চয় কয়লার চেয়ে লাভজনক। অদূর ভবিষ্যতে থোরিয়ামকে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে কাজে লাগাতে পারব। তখন লাভের পরিমাণ আরও বাড়বে।

কেউ কেউ সমালোচনা করেন। বলেন, পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্রের চল বেড়ে গেলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত প্রতিক্রিয়ায় পরিবেশ বিষাক্ত হবে। দুরারোগ্য ব্যাধি এবং প্রজননগত বৈকল্যে আক্রান্ত হবে মানুষ, অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদ। কিন্তু কতটুকু বাস্তব এ সব ধারণা? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, কয়লার দরুন মানুষ যত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তুলনায় তার সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশী। দেখা গেছে, দশ হাজার কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যতটা কয়লা দরকার, খনি থেকে সেই কয়লা তুলতে গিয়ে শুধু ফুসফুসের রোগেই (ব্ল্যাক লাংগ) মারা যায় এক হাজার শ্রমিক। অথচ ওই একই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে যতটা ইউরেনিয়াম দরকার তা তুলতে গিয়ে ক্যানসারে আক্রান্ত হয় মাত্র কুড়ি জন।

ইদানীং প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের চল হয়েছে। এটা করতে গিয়ে অতিরিক্ত পাওনা হিসেবে আমরা পাচ্ছি প্লুটোনিয়াম। এই প্লুটোনিয়ামকেও শক্তি উৎপাদনের জন্যে কাজে লাগান যায়। এ-কথা ঠিক, প্লুটোনিয়াম নাড়াচাড়া করা খুবই শক্ত কাজ। এতটুকু ত্রুটি হলে প্লুটোনিয়াম পরিবেশ দূষিত করতে পারে। জনস্বাস্থ্যে আনতে পারে বিপর্যয়। তবে তা যাতে না হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রেখেছেন বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি ব্রিটেনের হারওয়েল পরমাণু কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে, কারোর শরীরে প্লুটোনিয়াম ঢুকলে তার রক্ত এবং দেহ-কোষ থেকে সেই প্লুটোনিয়াম পুরো-পুরি বের করে দেওয়া সম্ভব। এর জন্যে দরকার এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ।

নাম ক্যালসিয়াম ডাইথোলিন ট্রাইঅ্যামাইন পেনটা অ্যাসেটিক অ্যাসিড। এই বস্তুটি শরীরে ঢুকিয়ে দিলেই রক্ত এবং দেহ-কোষে জমে থাকা প্লুটোনিয়ামের সবটাই সে শরীর থেকে বের করে দেবে। বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

আরও একটা দিক ভাবা দরকার। কয়লা এবং কয়লা পোড়ানর পর যে ছাই পাওয়া যায় তাদের মধ্যেও থাকে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ রেডিয়াম-২২৬। এই বস্তুটি থেকে বের হয় বিটা-রশ্মি। এই বিকিরণটিও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কম ক্ষতিকর নয়। পাঁচশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উপাদনক্ষম একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পাওয়া যায় প্রায় আঠার হাজার লরি ছাই। এই ছাই সরিয়ে ফেলার সমস্যাটির কথা একবার ভাবুন। অথচ ওই একই পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে পারমাণবিক কেন্দ্র থেকে যতটা পারমাণবিক ছাই বেরিয়ে আসে তার পরিমাণ মাত্র আধ লরির মত। এই ছাইকে যথাযথ আচ্ছাদনের মধ্যে ঢেকে নিরাপদ জায়গায় পেঁাছে দিতে দরকার মাত্র তিরিশটি লরি। বলাই বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে পরিবহন খরচ অনেক কম।

প্লুটোনিয়াম চুরি করে সন্ত্রাসবাদীরা পরমাণু বোমা তৈরি করতে পারে, কেউ কেউ এমন আশংকার কথাও বলছেন ইদানীং। এ ধারণাটাও অবাস্তব। প্লুটোনিয়ামের সাহায্যে বোমা তৈরি করতে গেলে বড় রকমের কারিগরি সাহায্য দরকার। প্লুটোনিয়াম ক্ষণস্থায়ী আইসোটোপ। একে নিষ্কাশিত করে অনতি-বিলম্বে মিশিয়ে নেওয়া হয় ইউরেনিয়ামের সঙ্গে। তারপর সেই মিশ্রণ জ্বালানি হিসেবে প্রস্তুত করা হয়। ইউরেনিয়ামের ওই মিশ্রণ থেকে প্লুটোনিয়াম নিষ্কাশন করা খুবই শক্ত কাজ। এ কাজে যদি কোন রাষ্ট্র গোপনে না সাহায্য করে, গুটিকয় সন্ত্রাসবাদীর পক্ষে সেই প্লুটোনিয়াম নিষ্কাষণ করে বোমা তৈরি করা কখনই সম্ভব নয়।

ডঃ রামান্না মনে করেন, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল এবং আছেও। অনেক সমস্যা কাটিয়েও ওঠা গেছে ইতিমধ্যে। ভবিষ্যতে আরও কাটিয়ে ওঠা যাবে। এ ব্যাপারে বিরূপ সমালোচনা করার আগে সব কিছু খতিয়ে দেখা দরকার।

গবেষণা, উদ্ভাবনা এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ভারতীয় পারমাণবিক শক্তিসংস্থা এখন পুরোপুরি আত্মনির্ভর। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরে ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্রে তাঁরা চালু করলেন ১০০ মেগাওয়াটের একটি গবেষণা-চুল্লি—ধ্রুব। চুল্লিটির পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নির্মাণকার্য, ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং কুশলীরাই করেছেন। এ ধরনের চুল্লি পৃথিবীতে এই প্রথম তৈরী হল। একই বছরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে কলপক্কমে মাদ্রাজ পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে (MAPS)-এর দ্বিতীয় ইউনিট। প্রাথমিক পর্যায়ে চালু হল কলপক্কমের ফাস্ট ব্রীডার টেস্ট রিঅ্যাক্টর। এ ছাড়া ১৯৮৫ সালের গোড়ায় অতিমাত্রার তেজস্ক্রিয় জঞ্জাল অপসারণের জন্যে তারাপুরে বসান হয়েছে 'ভিট্রিফিকেসন প্ল্যান্ট'। এই প্ল্যান্টে পারমাণবিক চুল্লির তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, যা জঞ্জাল হিসেবে তৈরি হয় তাদের বিশেষ ধরনের কাচের মধ্যে সংবদ্ধ করা হয়ে থাকে। এতে করে পরিবেশ তেজস্ক্রিয়তা থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছে। প্ল্যান্টটির উদ্ভাবক ভাবা পারমাণবিক শক্তি গবেষণাগার। ওই গবেষণাগারের বিজ্ঞানী এবং উদ্ভাবকরা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ১৯৮৫ সালের মার্চ-এ তিরুচিলাপল্লিতে চালু করেছেন এ দেশের প্রথম ম্যাগনেটো হাইড্রোডাইয়ানামিক (mhd) পাইলট প্ল্যান্ট। এটি বিদ্যুৎশক্তির বিকল্প উৎস। এটিও তৈরি করেছেন ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী এবং কুশলীবৃন্দ। ৫ মেগাওয়াটের এই প্ল্যান্টটি ভারতীয় প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি বড়রকম সাফল্য।

তারাপুর অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন (TAPS), রাজস্থান অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন (RAPS) এবং মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন (NAPS)—এই তিনটি পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রই এখন নিয়মিত বিদ্যুৎ উৎপাদন করে চলেছে। রাজস্থান কেন্দ্রটির এক নম্বর চুল্লির প্রান্তভাগের আবরণটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এই চুল্লিটির উৎপাদন বেশ কিছুকাল ধরে বন্ধ ছিল। এটির মেরামত খুবই জটিল কাজ। সুখের কথা, ভারতীয় কুশলীরা নিজেদের চেষ্টায় দুরূহ এই কাজটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। এরপর চুল্লিটি চালুও হয়। কিন্তু ২০ মে, ১৯৮৫ ওই আবরণে আবার ফাটল দেখা দেয়। এখন সেই ফাটলের মেরামতি কাজ চলছে। সৌভাগ্য, এর দরুন এখনো কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

২০০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এদেশে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলি থেকে যাতে আরো দশ হাজার মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে পারমাণবিক শক্তিদফতর কাজ করে চলেছেন। ইতিমধ্যে উত্তর ভারতের নারোরায় একটি শক্তিকেন্দ্র তৈরির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এখানে বসছে

দুটি ইউনিট। আশা করা যায় ইউনিট দুটির উৎপাদন যথাক্রমে ১৯৮৭-৮৮ এবং ১৯৮৮-৮৯ সালে চালু হয়ে যাবে। দ্রুত কাজ চলছে কারাপার পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের। এখানেও বসছে দুটি ইউনিট। ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ সালে এ দুটির চালু হওয়ার কথা। এছাড়া আরো দুটি কেন্দ্র তৈরিরও কাজ শুরু হয়েছে। এগুলির মধ্যে একটি বসছে দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটকের কায়গায়। অপরটি বসছে উত্তর ভারতের রাজস্থানে। প্রতিটি কেন্দ্রেই থাকবে দুটি করে ইউনিট। প্রতিটি ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা ২৩৫ মেগাওয়াট। এই কেন্দ্র দুটির উৎপাদন শুরু হওয়ার কথা ১৯৯৪-৯৫ সালে। ভবিষ্যতে আরো বড় ধরনের ইউনিট তৈরির কাজেও হাত দিচ্ছেন পারমাণবিক শক্তি দফতর। এই ইউনিটগুলির এক একটির উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে ৫০০ মেগাওয়াট। এগুলির প্রাথমিক পরিকল্পনার কাজও শেষ হয়েছে।

গত দুই দশকে পারমাণবিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে বিস্তর। গোড়ায় পারমাণবিক চুল্লিগুলিতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম। আকরিক হিসেবে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় তার মধ্যে থাকে মুখ্যত দু রকম আইসোটোপ—ইউরিনিয়াম-২৩৮ এবং ইউরেনিয়াম-২২৫। ইউরেনিয়াম ২৩৮ থাকে ৯৯.৩ শতাংশের মত। আর ইউরেনিয়াম ২৩৫ থাকে ০.৭ শতাংশ মাত্র। কৃত্রিম উপায়ে আকরিক থেকে ইউরেনিয়মি-২৩৮-এর মাত্রা কিছুটা কমিয়ে বাড়ানো হয় ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর মাত্রা। ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর মিশ্রণে অতিরিক্ত ইউরেনিয়াম-২৩৫ থাকলে সেই মিশ্রণকে বলা হয় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম। অতিরিক্ত ব্যয়বহুল বলে ভারতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের প্ল্যান্ট বসান সম্ভব হয়নি। ফলে তারাপুর পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছে। এখনো হচ্ছে। এতে ঝঞ্ঝাটও পোহাতে হয় যথেষ্ট। যে সময় তারাপুরের কেন্দ্রটি তৈরি হয় সে সময় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার চল ছিল বেশি। অর্থাৎ তৎকালীন প্রযুক্তি অনুযায়ী যে সব চুল্লি তৈরি হত, তাতে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামই জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগান হত। ফলে তারাপুর কেন্দ্রে ওই ধরনের চুল্লিই কাজে লাগান হয়। এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম জ্বালানি সংগ্রহ করতে হয় বিদেশ থেকে। এ ধরনের চুল্লির বড় রকমের সুবিধে দুটি: এক, জ্বালানির মধ্যে থাকে অতিরিক্ত ইউরেনিয়াম-২৩৫। নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়াম-২৩৫ বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে ভিন্নতর পদার্থের পরমাণু। বিভাজনের ব্যাপারটি সুসম্পন্ন করতে গেলে নিউট্রন কণার গতি নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'মডারেসন'। নিউট্রনের গতি নিয়ন্ত্রণ এ ক্ষেত্রে সাধারণ জলের সাহায্যেই করা যায়। জলের ভেতর দিয়ে নিউট্রন কণা প্রবাহিত করে। এ ক্ষেত্রে জলকে বলা হয়

মডারেটার। দুই, বিভাজনের সময় নির্গত হয় উত্তাপশক্তি। এই উত্তাপে জলকে বাষ্পে পরিণত করে, তার চাপে চালান হয় টারবাইন। টারবাইনের সঙ্গে জোড়া থাকে জেনারেটার। টারবাইন চালু হলেই জেনারেটার থেকে উৎপন্ন হতে থাকে বিদ্যুৎ শক্তি। বিভাজনের ফলে যে উত্তাপশক্তি নির্গত হয়, সেই উত্তাপের হাত থেকে চুল্লিটি বাঁচানর জন্যে চুল্লিটি যাতে শীতল থাকে সে দিকে নজর রাখতে হয়। এই শীতল রাখার কাজেও ব্যবহার করা চলে জল। ইংরেজিতে এ ক্ষেত্রে জলকে বলা হয় কুল্যান্ট (Coolant)। অর্থাৎ তারাপুরের পারমাণবিক চুল্লিতে জল 'মডারেটার' এবং 'কুল্যান্ট' হিসেবে কাজ করে। আর যেহেতু জল সহজলভ্য বস্তু, এ ব্যাপারে সমস্যা থাকে কম।

কিন্তু ইদানীং যে ধরনের চুল্লির চল হয়েছে তাতে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম। এই জ্বালানিতে ইউরেনিয়াম-২৩৮ আইসোটোপের পরিমাণ ৯৯.৩ শতাংশ, ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর ০.৭ শতাংশ। সমস্যা হল, জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহার করলে 'কুল্যান্ট' এবং 'মডারেটার' হিসেবে ব্যবহার করতে হয় 'ভারী জল'। রাজস্থান এবং কলপক্কমের পারমাণবিক চুল্লিগুলিতে ভারী জল ব্যবহার করা হচ্ছে। পরবর্তী চুল্লিগুলিতেও ব্যবহার করা হবে ভারী জল।

গোড়ায় ভারী জল যোগানর ব্যাপারটা ছিল একটি বড়রকম সমস্যা। এর জন্যেও বিদেশের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে আমাদের। তবে ভারী জলের চাহিদা পূরণের জন্য এবং এ ব্যাপারে ভারত যাতে আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারে সেদিকেও নজর রেখেছেন পারমাণবিক দফতর। সাধারণ জলে থাকে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন—যৌগ হিসেবে। এই যৌগটিকে হাইড্রোজেনের অকসাইডও বলা চলে। হাইড্রোজেনের রয়েছে দুটি আইসোটোপ—ডয়েটেরিয়াম এবং ট্রিশিয়াম। ডয়েটেরিয়ামের ভর হাইড্রোজেনের ভরের দ্বিগুণ। ট্রিশিয়ামে ভর হাইড্রোজেনের ভরের তিন গুণ। ডয়েটেরিমাকে বলা হয় ভারী হাইড্রোজেন।

আর ডয়েটেরিয়াম অকসাইডকে বলা হয় ভারী জল। বলা বাহুল্য সাধারণ জলের মধ্যে মিশে থাকে কিছুটা ভারী জল। তবে তার পরিমাণ খুবই নগণ্য। তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে জল থেকে হাউড্রোজেন পৃথক করা যায়। সেই হাইড্রোজেনের সঙ্গে কিছুটা ডয়টেরনও পাওয়া যায়। তাই প্রথম দিকে ঠিক হয়েছিল যে সব কারখানায় হাইড্রোজেন উৎপাদন করতে হয়, সেখানে গড়ে তোলা হবে জল উৎপাদনের ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াঘটিত সার কারখানাই আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অ্যামোনিয়ায় থাকে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন। নাইট্রোজেন সংগ্রহ হয় বাতাস থেকে, এবং হাইড্রোজেন জল থেকে। 'আয়ন এক্সচেঞ্জ' পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন থেকে পৃথক করা হয়

ডয়টেরিয়াম। হইড্রোজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে উৎপন্ন করা হয় অ্যামোনিয়া গ্যাস। অ্যামোনিয়া ব্যবহার করা হয় সার উৎপাদনে। আর উপদ্রব্য হিসেবে যে ডয়েটেরিয়াম পাওয়া গেল তার সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে ব্যবস্থা করা হল ভারী জল উৎপাদনের।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারী জল উৎপাদনের এই পদ্ধতিটি লাভজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু পরে দেখা গেল সার কারখানার ভারী জলের প্ল্যান্ট চালু করতে গিয়ে কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। যেমন ধরুন তালচেরের প্ল্যান্ট। বিদ্যুতের অভাবে এই প্ল্যান্টটির উৎপাদন খুবই ব্যাহত হয়েছে। দীর্ঘকালীন ধর্মঘটের দরুনও ব্যহত হয়েছে ভারী জলের উৎপাদন। ফলে মাদ্রাজের পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রটি চালু হতে দেরি হয়—ভারী জলের অভাবে। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া থেকে ভারী জল আমদানি করে প্ল্যানটি চালু করতে হয়েছে।

সুখের কথা, ভারী জল যোগানর এই সমস্যাটি এখন অনেকটা কেটে গেছে। আপাতত ভারী জলের উৎপাদন চলছে চার জায়গায়—বরোদা, তুতিকোরিন, তালচের এবং রাজস্থানের কোটায়। ভারী জলের আরো দুটি প্ল্যান্ট তৈরির কাজ চলছে—একটি থাল-এ, অপরটি মানুগুরুতে। থাল-এর উৎপাদন ক্ষমতা ১১০ টন। ১৯৮৭ সালে এটির চালু হওয়ার কথা। ভারী জল উৎপাদনের জন্যে এখানে 'অ্যামোনিয়া-হাইড্রোজেন এক্সচেঞ্জ' পদ্ধতি কাজে লাগান হবে। পরিবর্তে মানুগুরুর প্ল্যান্টে কাজে লাগান হবে 'হাইড্রোজেন সালফাইড ওয়াটার এক্সচেঞ্জ' পদ্ধতি। তথানে বসান হচ্ছে বাইশটি 'ভারী জল এক্সচেঞ্জ' টাওয়ার। ইতিমধ্যে কুড়িটির নির্মাণ কাজ শেষ। প্ল্যান্টটির উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১৮৫ টন। ১৯৮৮ সালে এটি চালু হওয়ার কথা।

সমস্যা পারমাণবিক জ্বালানির ব্যাপারেও। আপাতত বিহারের যদুগোড়া থেকে সংগৃহীত হচ্ছে ইউরেনিয়াম। এখানকার সঞ্চয়ও কমে আসছে। এই সমস্যাটির মোকাবিলায় 'অ্যাটমিক মিনারেল ডিভিশন' ১৯৮৫-৮৬ সালে নতুন পর্যায়ে শুরু করেছে পারমাণবিক খনিজ অনুসন্ধানের কাজ। এই অনুসন্ধানের ফলে বিহারের সিংভুম জেলার টুরামদিহিতে পাওয়া গেছে ইউরেনিয়ামের একটি নতুন খনিজ স্তর। এই স্তরটি প্রায় ৩০ মিটার পুরু। ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ মিটার নিচে এটি অবস্থান করছে। স্তরটি থেকে কয়েক হাজর টন ইউরেনিয়াম অকসাইড ($U_3 O_8$) পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কর্ণাটকের আরবেইল, বিহারের মহুলডিহি এবং মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারিটোলা এবং জাজাওয়ালেও সন্ধান মিলেছে ইউরেনিয়াম খনিজের। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ইউরেনিয়াম জ্বালানির একটি বড় রকমের অংশ এদেশেই সংগ্রহ করা যাবে।

পারমাণবিক জ্বালানি প্রস্তুতকরণ এবং শক্তিউৎপাদনে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক

ধাতু নিষ্কাশনের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছে হায়দ্রাবাদের 'নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেক্স'। এখানে সংযোজিত হয়েছে বিশেষ একটি ইউনিট—'স্পেশাল মেটিরিয়াল প্ল্যান্ট'। এই প্ল্যান্টটিতে এখন বিশোধন করা হচ্ছে নানারকম ধাতু—অ্যান্টিমনি, টেলুরিয়াম, সেলেনিয়াম, সোনা এবং গোল্ড-পটাসিয়াম সায়ানাইড। এগুলির বিশুদ্ধতা ৯৯.৯৯৯ শতাংশ। বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের উপাংশ তৈরিতে এগুলির চাহিদা অপরিহার্য। জারকোনিয়াম এবং বিভিন্ন ধাতুসংকর তৈরির ব্যাপারেও এই প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে।

পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র সম্প্রসারণের ব্যাপারে এ সবই সাফল্যের সূচক সন্দেহ নেই। তবে যে গতিতে কাজ চলছে, তাতে অনেকে মনে করছেন, পারমাণবিক শক্তি দফতর যে বলে আসছেন আগামী ২000 খ্রীস্টাব্দে তাঁরা আরো দশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করবেন, সেটা হয়ত বাস্তবায়িত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাঁদের বক্তব্য, পূর্বঘোষিত সময়ের মধ্যে কোন প্রকল্পই এ পর্যন্ত তাঁরা সম্পন্ন করতে পারেননি এবং যেভাবে কাজ চলছে, অদূর ভবিষ্যতেও যে পারবেন, বলা শক্ত।

ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটিয়ে যে শক্তি উৎপাদন সম্ভব, সেটা পরীক্ষামূলক ভাবে প্রথম প্রমাণ করেছিলেন নোবেলবিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মি এবং তাঁর কয়েকজন সতীর্থ। তারিখ ২ ডিসেম্বর, ১৯৪২। স্থান শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর। চত্বরের দক্ষিণে একটি ফুটবল খেলার মাঠ। মাঠের পাশে একটি মটরশুঁটির পোড়ো ক্ষেত। তার এক মাইল দূরে লেক মিশিগান। ফের্মি তাঁর চল্লিশজন সহকর্মী নিয়ে সেই পড়ো ক্ষেতে সদ্য নির্মিত একটি গবেষণাগারে সম্পন্ন করলেন প্রথম নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক শৃংখল বিক্রিয়া'। 'এই বিক্রিয়ার জন্যে তিনি এবং তাঁর সহকারীরা তৈরি করেছিলেন গ্র্যাফাইটের তৈরি একটি কাঠামো। তার ভেতরে রেখে দেওয়া হয়েছিল সাত টন ইউ-রেনিয়াম। আর নিউট্রন কণা নিয়ন্ত্রণের জন্যে নেওয়া হয়েছিল কয়েকটি ক্যাডমিয়াম দণ্ড। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল এই ঃ মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে পৃথিবীর বুকে বর্ষিত হচ্ছে নিউট্রন কণাও। আবার ইউরেনিয়ামের স্বতঃস্ফুর্ত বিভাজনের ফলেও সৃষ্ট হচ্ছে নিউট্রন কণা ঃ এই সব নিউট্রন কণার আঘাতে চলুক শৃংখলিত পারমাণবিক বিভাজন। আর সেই বিভাজনকেই নিয়ন্ত্রণ করা হবে গ্রাফাইট এবং ইউরেনিয়াম স্তরের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা ক্যাডমিয়াম দণ্ডগুলি হিসেব মত উপর নিচ করে। স্থূল অর্থে ব্যাপারটা দাঁড়াল যেন 'সেফটি ভাল্বের' মত। ভাল্ব কিছুটা উপরে উঠলে, যেমন বয়লারের ভেতরের গ্যাস কিছুটা বেরিয়ে গিয়ে বয়লারের মধ্যেকার চাপ কমায়, এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা কতকটা দাঁড়াল সেই রকম। ক্যাডমিয়াম দণ্ড কিছুটা উপরে তুললে নিউট্রন বর্ষণের মাত্রা বাড়বে। অর্থাৎ বেশি পরিমাণ নিউট্রন কণা আঘাত করবে ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসে। ক্যাডমিয়াম দণ্ড নামিয়ে নিয়ে নিউট্রন বর্ষণের সামনে বাধা সৃষ্টি করলে বিভাজনের মাত্রা হবে কম।

পরীক্ষায় সফল হলেন ফের্মি এবং চল্লিশজন সঙ্গী। এই প্রথম প্রমাণিত হল, পারমাণবিক বিভাজন নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। জানা গেল এই বিভাজনের দরুন এক পাউন্ড ইউরেনিয়াম থেকে যে পরিমাণ উত্তাপ শক্তি নির্গত হয় তা ২৩ লক্ষ পাউন্ড কয়লা থেকে নির্গত উত্তাপ শক্তির সমান। বলা বাহুল্য, ফের্মি তাঁর পরীক্ষায় ব্যবহার করেছিলেন প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম। অর্থাৎ যে ইউরেনিয়াম খনিজ থেকে নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে। এই ইউরেনিয়ামের মধ্যে থাকে ৯৯.৩ শতাংশ ইউরেনিয়াম ২৩৮ এবং ০.৩ শতাংশ ইউরেনিয়াম-২৩৫। অতএব ফের্মি তাঁর পরীক্ষায় যে সাত টন প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম কাজে লাগান তার ভেতর ইউরেনিয়াম-২৩৫ ছিল ১০০ পাউণ্ডের মত।

এই ঘটনার পনের বছর পর প্রতিষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি

সংস্থা—২৯ জুলাই, ১৯৫৭। ওই বছর এই সংস্থার দুটি সদস্য দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তিনটি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র চালু অবস্থায় ছিল। তাদের এক-একটির উৎপাদন ক্ষমতা ১০৫ মেগাওয়াট। আর তার পঁচিশ বছর পর ২৯ জুলাই, ১৯৮২ সালে পৃথিবীর চুল্লির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭৭। যাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১,৫৭,৫০০ মেগাওয়াট। এই পরিমাণ পৃথিবীর মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৯ শতাংশ। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন যে অনেক নির্ভরযোগ্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকেও লাভজনক এই ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন নিয়ে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়েছে বিস্তর। পারমাণবিক চুল্লির উৎকর্ষ বাড়ান, চুল্লিস্থাপনের খরচ কমান—এ সবতো আছেই, এই সঙ্গে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে পারমাণবিক ভস্ম সমস্যার উপর। বিভাজনের পর চুল্লির মধ্যে পড়ে থাকে নানা রকম তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ। সামগ্রিকভাবে যাদের বলা হয় ভস্ম। এই ভস্ম কয়লার ছাই নয় যে যেখানে সেখানে স্তূপ করে ফেলে রাখলেই চলে। অত্যন্ত সাবধানে পারমাণবিক ভস্ম সরাতে হয়। সিসের তৈরি বিশেষ আধারে পুরে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এইসব ভস্ম এমন ভাবে সংরক্ষিত করতে হয় যাতে করে তাদের ক্ষতিকর বিকিরণ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ না পায়। এ ছাড়া পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে যাঁরা কাজ করবেন তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ তাঁদের স্বাস্থ্যের যাতে না ক্ষতি করে সে দিকেও কড়া নজর দিতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের। এ পর্যন্ত আর কোনো শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থায় এত বেশি সতর্কতার প্রয়োজন হয়নি। ভাবতে হয়েছে পারমাণবিক জ্বালানিরও কথা। প্রথম দিকে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম চালু হয়। বিশেষ পদ্ধতিতে এই ইউরেনিয়ামে ইউরেনিয়াম-২৩৫ আইসোটোপের মাত্রা কিছুটা বাড়ান হয়ে থাকে। পরে শুধু প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম যাতে শক্তি উৎপাদনে কাজে লাগান যায়—তারও ব্যবস্থা হয়। বিভাজনক্ষম জ্বালানি হিসেবে এখন গবেষণা চলছে থোরিয়ামের উপর নিউট্রন কণার সাহায্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে থোরিয়াম-২৩২কে ইউরেনিয়াম-২৩৩-এ রূপান্তরিত করা এবং তারপর সেই ইউরেনিয়াম-২৩৩এর বিভাজন ঘটিয়ে শক্তি উৎপাদন—এ সব ব্যাপারেও কাজ চলছে বেশ কয়েকটি দেশে। ভারতেও। ইউরেনিয়াম চুল্লিতে এক একটি, ইউরেনিয়াম-২৩৮ নিউক্লিয়াস এক একটি নিউট্রন কণা শোষণ করে রূপান্তরিত হয় ভিন্ন এক ধরনের আইসোটোপ—প্লুটোনিয়াম-২৩৯।

এটিও বিভাজনক্ষম সামগ্রী। প্লুটোনিয়াম-২৩৯এর বিভাজন ঘটিয়েও পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। ১৯৫০-এর দশকে পারমাণবিক শক্তি-ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর দশটির বেশি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। তাদের প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে বিস্তর

গবেষণাও হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আপাতত চার রকম পারমাণবিক চুল্লি এখন চালু। এক। Pressurized water reactor বা সচাপ জল চুল্লি। দুই। Boiling water reactor বা ফুটন্ত জল চুল্লি। তিন। Heavy-water, natural-uranium reactor বা ভারী জল, প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম চুল্লি। এবং চার। Gas-cooled reactor বা গ্যাস-শীতক পারমাণবিক চুল্লি।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার শক্তি বিষয়ক বিভাগের ডাইরেকটর এইচ, জে, লাউ মন্তব্য করেছেন: নতুন নতুন পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে যেমন, সেই সঙ্গে অ্যামাদের অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। এর ফলে উত্তরোত্তর পারমাণবিক চুল্লির গঠন পরিবর্তিত হচ্ছে। তুলনামূলক ভাবে চুল্লি তৈরির খরচ পড়েছে কম। নির্ভরযোগ্যতা বাড়ছে। আগের চেয়ে দুর্ঘটনার সম্ভাব্যতা বহুগুণ কমেছে। কমেছে পরিবেশে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়ানোর ব্যাপারটা। চুল্লি পরিচালনায় মনুষ্যকৃত ত্রুটির পরিমাণ এখন অনেক কম। যন্ত্রপাতিও কম বিকল হচ্ছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে পারমাণবিক চুল্লি একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবে। এ ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে 'ব্রীডার রিঅ্যাকটর' এবং উচ্চ-তাপীয় চুল্লি (high-temperature reactor) চালু হওয়ার পর পৃথিবীর শক্তি চাহিদার একটি বড় রকম অংশ মেটাতে পারবে পারমাণবিক চুল্লি। প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের অন্যতম প্রতিস্থাপক হয়ে দাঁড়াবে।

লাউ-এর বক্তব্য আশাব্যঞ্জক সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তব চিত্রটি অন্য রকম।

গোড়া থেকে পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন পরিমাণ নিয়ে নানা রকম ভবিষ্যদ্‌-বাণী করে এসেছিলেন আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার বিশেষজ্ঞরা। গত বারো বছরে ওই সব ভবিষ্যদ্‌বাণী আবার নতুন করে পর্যালোচনা করেছেন তাঁরা। তাঁদের হিসেব মত পৃথিবীতে ১৯৭৩-৭৪এ পারমাণবিক শক্তির মোট উৎপাদন পরিমাণ হওয়ার কথা ৩৬০০ থেকে ৫০০০ মেগাওয়াট। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ১৯৯০ সালে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ানোর কথা ১৫০০ জিগা ওয়াট বা ১৫,০০,০০০ মেগা ওয়াট (এক হাজার মেগাওয়াট সমান এক জিগা ওয়াট)। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ২০০০ জিগাওয়াট। এখন এসব হিসেব নিয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ১৯৭৫-৮০ র মধ্যে যতটা উৎপাদন আশা করা গিয়েছিল, সে তুলনায় উৎপাদন ধাপে ধাপে কমে এসেছে। এখন বলা হচ্ছে ১৯৯০-২০০০ খ্রীষ্টাব্দে ভবিষ্যদ্বাণীর তুলনায় উৎপাদন অনেক কম হবে। আগে ভাবা হয়েছিল, তেলের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাওয়ায় এবং পেট্রোকেমিকেলের যথেষ্ট ঘাটতি হবে জেনে অনেকে হয়ত শক্তির বিকল্প উৎস হিসেবে পারমাণবিক শক্তি উৎসের উপরই গুরুত্ব আরোপ করবে বেশি। এই ধারণার উপর নির্ভর করেই ভবিষ্যতে সম্ভাব্য পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কতটা

বাড়তে পারে সে সম্পর্কে তাঁরা একটি ছক এঁকে নিয়েছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে সেই ছক আর মিলছে না।

কেন এই গরমিল?

লাউ বলছেন, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অনেক কারণেই কমেছে। প্রথমত, শক্তি ব্যবহারের ব্যাপারে পৃথিবীর বহু দেশ এখন খুবই সংরক্ষণশীল। অর্থাৎ এক কথায় অনেকেই এখন শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড হিসেবী হয়ে উঠেছে। অনেকেই বাস্তবসম্মত প্রয়োজন ছাড়া এতটুকু বাড়তি শক্তি আর খরচ করতে চায় না। এতে করে চাহিদা কমেছে। দ্বিতীয়ত, শক্তি সরবরাহ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে উন্নততর প্রযুক্তি কাজে লাগান হচ্ছে। এর ফলে শক্তির অপচয় কমেছে অনেকটা। আগে কোন একটি কাজে যতটা বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করা হত, সে কাজ এখন অনেক কম শক্তিতেই চলে। উদাহরণ স্বরূপ রেডিও টেলিভিশনের কথাই ধরুন। এক সময় রেডিও চালাতে কত বেশি শক্তি লাগত! ট্রানজিসটারের কল্যাণে এখন প্রয়োজন হয় নাম-মাত্র শক্তি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। তৃতীয়ত, যে সব উৎপাদন ক্ষেত্রে এক সময় প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হত, সেই সব সামগ্রীর উৎপাদন অনেকটা কমিয়ে আনার দরুন এখন শক্তির সাশ্রয় হচ্ছে। চতুর্থত, শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে বিগত কয়েক বছর মন্দা চলছে। এর ফলেও শক্তির চাহিদা কমেছে। তাই ভবিষ্যতে আরও শক্তির চাহিদা বাড়বে এ কথা মনে করে যারা নতুন পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র তৈরির জন্যে দাদন দিয়েছিলেন অথবা দাদনের কথা ভাবছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন পিছিয়ে এসেছেন।

এর উপর দাঁড়িয়েছে আরও কয়েকটি সমস্যা। কোন কোন দেশ ভাবছিল তারা বৃহত্তর উৎপাদন ক্ষমতার পারমাণবিক চুল্লি বসাবে। যাদের উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১০০০ থেকে ২৫০০ মেগাওয়াট। ৫০০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম চুল্লির কথাও ভাবছিল দু' একটি দেশ। কিন্তু এ ব্যাপারে বাদ সেধেছে জনসাধারণ। পারমাণবিক চুল্লির ব্যাপারে তাদের মনে এমনিতেই ভয়। ভয় দুর্ঘটনার দরুন, পারমাণবিক ভস্মের দরুন। তারা ভাবছে, অতিকায় কোন চুল্লিতে কোন কারণে যদি দুর্ঘটনা ঘটে তার তাল সামলাবে কে? কোটি কোটি মানুষের জীবন যে বিপন্ন হবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়? এমন অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ নিয়ে জুয়া খেলা চলে না। তা ছাড়া বড় চুল্লি মানে প্রচুর পারমাণবিক ভস্ম। পারমাণবিক ভস্ম সংরক্ষণের ব্যাপারে অনেক কথাই বলছেন অনেকে। প্রচুর পদ্ধতিও বের হয়েছে। কিন্তু আজ না হোক কাল—কোন এক সময় সংরক্ষিত সেই ভস্ম মুক্ত পৃথিবীর বুকে বিকিরণের আগ্রাসন ডেকে যে আনবে না তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? মানুষ তার বর্তমান অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে তেজস্ক্রিয় জঞ্জালের হাত থেকে জীবজগৎকে রক্ষা করার জন্যে যতটা সম্ভব

নিরাপত্তার কথা ভেবেছে। সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই সে গড়ে তুলেছে পারমাণবিক জঞ্জাল সংরক্ষণের ব্যবস্থা। পুরু সিসের আস্তরণ ভেদ করে বিকিরণ বাইরে ছড়াবে না—এ কথা ভেবে সিসের তৈরি আধারের মধ্যে পারমাণবিক জঞ্জাল পুরে ভূগর্ভস্থ লবণের খনি অথবা দূরবর্তী সমুদ্রের গভীরে সেই সব আধার সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ থেকে কুড়ি, পঁচিশ বা একশ' বছর পর তারা যে একই ভাবে থাকবে কে বলতে পারে সে কথা হলফ করে? জঞ্জাল মুক্তিকরণ ব্যবস্থায় যে কোন গোলমাল থাকবে না, সে সম্পর্কেই বা আমরা কতটা স্থির নিশ্চয়? বড় বড় পারমাণবিক চুল্লি মানে প্রচুর পারমাণবিক জঞ্জাল। সেই জঞ্জালের দৈত্যাকার স্তূপ যদি যথাযথ বিমুক্ত না করা যায়, বিপদের সম্ভাবনা থাকেই। কী ভাবে এ সব কাজ করা হয়—এ সব কাজের সত্যিকারের খুঁত কোথায়—বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ তার খবরই রাখে না। বিপজ্জনক কিছু ঘটলে বা বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকলে পরিচালকরা তা সাধারণ মানুষের কাছে গোপন করার চেষ্টা করেন। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একেবারে চেপে যান। এই যদি অবস্থা—নাই বা তৈরি করা হল বৃহদাকার পারমাণবিক চুল্লি! জনসাধারণের এই মনোভাব পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এখন বৃহদাকার চুল্লি স্থাপনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চুল্লির দাদন কমে যাওয়ায় কোন কোন ইউরেনিয়াম খনির অবস্থাও এখন সংকটপূর্ণ। ভবিষ্যতে ইউরেনিয়ামের চাহিদা প্রচুর বাড়বে বলে যাঁরা খনিজ উৎপাদন সম্প্রসারিত করেছিলেন, এখন তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত। কোন কোন খনির উৎপাদন কমিয়ে আনা হয়েছে। কোন কোন খনি এখন বন্ধের মুখে।

এর পর গোদের উপর বিষ ফোঁড়া—অন্তত পারমাণবিক ব্যবসায়ীদের কাছে। সম্প্রতি International Nucler Fuel Cycle Evaluation Study (INFCE) মন্তব্য করেছেন ঃ জনকল্যাণের প্রয়োজনে পারমাণবিক সংস্থা গড়ে উঠেছে প্রচুর। এই সব প্রতিরক্ষা বহির্ভূত সংস্থা শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে জঞ্জাল হিসেবে তৈরি করছে পারমাণবিক ভস্ম। এই ভস্মের অন্যতম উৎপাদন উপাদান প্লুটোনিয়াম-২৩৯। কিছুটা ইউরেনিয়াম-২৩৫-ও থাকে। এই সব সামগ্রী বোমা তৈরির কাজে কেউ ব্যবহার করবে না তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? পৃথিবীর জনসাধারণ এ ব্যাপারে এখন খুবই সরব। নিয়ত তারা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে যে সব দেশ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের নানা রকম সামগ্রী উৎপাদন করে তারা সন্ত্রস্ত। নতুন পারমাণবিক চুল্লি তৈরির ব্যাপারে এখন ভাঁটা পড়েছে। নতুন পারমাণবিক চুল্লি বসানর দাদনও যাচ্ছে কমে। বিগত দশকে যে সংখ্যক পারমাণবিক চুল্লি ভবিষ্যতে বসান হবে বলে অনেকে মনে করেছিলেন, তাঁরা এখন মনে করছেন সে সংখ্যা কমবে। অন্তত বিভাজন-চুল্লির ক্ষেত্রে তো বটেই। তাই অনেকে আশঙ্কা করছেন, ২০০০

খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পারমাণবিক চুল্লির সংখ্যা প্রক্ষেপিত হিসেব অনুযায়ী কম হবে।

এইসব বাধাবিঘ্নের কথা ভেবে ভবিষ্যতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের চাহিদা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা মনে করেন, ১৯৯০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে মোট পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৩০ জিগাওয়াট। বিভিন্ন পদ্ধতিতে উৎপাদিত মোট শক্তির ১৮ শতাংশ। অতএব শক্তির চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে পারমাণবিক শক্তি যে বড় রকমের একটি সংস্থান সৃষ্টি করবে না তা বলাই বাহুল্য। ১৯৯০-এর মধ্যে যে ৩৩টি দেশ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করবে তাদের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ থাকবে মাত্র ১০টি। এই ১০টি দেশে থাকবে মোট ৩৮টি পারমাণবিক উৎপাদন ইউনিট। যাদের উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে ২৪০০০ মেগাওয়াটের মত। যা তাদের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার মাত্র ৫ শতাংশ পূরণ করতে পারবে। তুলনায় উন্নত দেশগুলিতে এই পরিমাণ দাঁড়াবে ২০ শতাংশ।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বেশ কয়েকটি উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি শুরু হওয়ার পর অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যা, পরিচালনার অব্যবস্থা, লাইসেন্স এবং প্রযুক্তিগত সমস্যার দরুন। এ ধরনের চুল্লির সংখ্যা ৩০। যাদের উৎপাদন ক্ষমতা হওয়ার কথা ২৭০০০ মেগাওয়াট। ১৭টি চুল্লি কাজই শুরু করেনি। এদের মধ্যে ভারতের কলপক্কমে তৈরি পারমাণবিক চুল্লিও পড়ে। ১৯৮০ সালে বর্তমান লেখক যখন সেই চুল্লিটি দেখতে যান, তখন তাঁকে বলা হয়েছিল এটি ১৯৮০-র মধ্যেই চালু হবে। এখনও হয়নি। ভারতের চতুর্থ পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে উত্তরপ্রদেশের নারোরায়। তার ভবিষ্যৎ কি—বলা শক্ত। পৃথিবীতে মোট ১৭টি উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ ৩০ থেকে ১০০ শতাংশ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বন্ধ রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে ইরানের বুশার পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র এবং অস্ট্রিয়ার জিভেনটেনডর্ফ (Zwentendorf) পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র। ১৯৮২ সালের প্রথমার্ধের পর শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এই অবস্থায় পড়ে রয়েছে ১৩টি পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র। পরিচালনার অব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং বিদ্যুৎশক্তি চাহিদার হ্রাসই তার অন্যতম কারণ। এর সঙ্গে রয়েছে রাজনৈতিক চাপ। পৃথিবীর মোট ৭টি উৎপাদন কেন্দ্রে বছর দুই বন্ধ। মেরামতির অভাবে। বেশ কয়েকটি প্ল্যাণ্ট স্টিম জেনারেটারের গলদের দরুন ক্ষমতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছে না। ভারতীয় পারমাণবিক কেন্দ্রগুলিও এদের মধ্যে পড়ে।

সন্দেহ নেই, এ ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে প্রচুর। কাজে না নামলে সে সব সমস্যা আগে থেকে অনুমান করাও অনেক সময় সম্ভব হয় না। সম্প্রতি ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি কমিশন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রচুর। তবে দেখা যাচ্ছে

তাঁদের বেশির ভাগ প্রতিশ্রুতি ইদানীং ব্যর্থ হচ্ছে। ১৯৭৭-এ কলকাতায় সাইক্লোট্রন সম্পর্কে যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ—এই ১৯৮২-তেও। মাদ্রাজের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র আজও অচল। ভারী জল এখনও ভারী হয়েই রইল—তোলা গেল না। এ সব নিয়ে বাস্তব-সম্মত অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। কথাটা আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি কমিশনের বয়ান দেখার পরই মনে এল। ভারত দরিদ্র দেশ। অপচয়ের বাদশাহী চাল এখানে চলে না। ভাবাবেগও নিরর্থক। পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের সত্যিকারের বাধাবিঘ্ন কি সেটা এখনই খতিয়ে দেখা দরকার।

১৬ জুন ১৯৭৭। মধ্যরাত্রি। কলকাতার লবণহ্রদ উপনগরী তখন সুষুপ্ত। ব্যতিক্রম শুধু একটি বাড়ি। সেই উপনগরীরই এক প্রান্তে। সেখানে তখন মধ্যাহ্নের ব্যস্ততা। যুদ্ধকালীন তৎপরতা নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে প্রচণ্ড পরিশ্রম করার পর উদ্বেলিত হৃদয়ে সেখানে মুহূর্ত গুণে চলেছেন কয়েক ডজন পরমাণুবিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্ এবং কুশলী। সবার মনেই এক প্রশ্ন ঃ সাফল্য, না ব্যর্থতা?

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলল। সেই সঙ্গে একে একে শেষ করা হল শেষ প্রস্তুতির পালা।

অতঃপর কণ্ট্রোল রুম থেকে মাইক্রোফোনের ঘোষণা ঃ সাবধান! ভল্টের মধ্যে এবার তৈরি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ।

মুহূর্তে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হল কণ্ট্রোল প্যানেলের সারিবদ্ধ-ভাবে বসান নির্দেশক কাঁটাগুলির ওপর। ভ্যাকুয়াম চালু হয়েছে। চালু হয়েছে ঠাণ্ডা জলের পাম্প, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অসিলেটার। হাজার হাজার বিভব মাত্রার তড়িৎবর্তনী।

রুদ্ধশ্বাস! সবাই রুদ্ধশ্বাস। দীর্ঘ দশ বছরের পরিকল্পনা এবং পরিশ্রমের পর শেষ মুহূর্তে এসেও সবার মনে একই প্রশ্ন ঃ সাফল্য, না ব্যর্থতা?

পূব আকাশ ফরসা হয়ে উঠল কখন, কেউ জানেন না। ঘড়িতে তখন ছ'টা।

ভল্টের মধ্যে বসান যন্ত্র দানবটির হৃদস্পন্দন ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। কণ্ট্রোল রুমে বসান টেলিভিশন পর্দায় ভেসে উঠেছে একফালি আলো। শুরু হল যন্ত্রগণকের মগজের লড়াই।

হ্যাঁ, সাফল্য! পরক্ষণেই যন্ত্রগণক জানিয়ে দিল, তাঁরা সফল হয়েছেন। পরিকল্পনামত সেই যন্ত্রদানব থেকে বেরিয়ে আসছে তেজস্ক্রিয় রশ্মি। প্রচণ্ড তার শক্তি। প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। তবে সাধারণ আলোক রশ্মি বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য নয়। তেজস্ক্রিয় কণার প্রবাহ। আলফা কণা। যন্ত্রদানবটি বসান হয়েছে বিরাট এক ভ্যাকুয়াম বা বায়ুশূন্য চেম্বারের মধ্যে। সেখানে রেখে দেয়া হয়েছিল একফালি তামার পাত। আলফা কণা প্রচণ্ড বেগে এসে আঘাত করল সেই তামার পাতের ওপর। শুরু হল পারমাণবিক বিক্রিয়া। রিমোট কণ্ট্রোল থেকে স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে যে সব তথ্য পাওয়া গেল তা থেকে জানা গেল বিক্রিয়াটি ছিল এই রকম ঃ

আলফা কণা + তামা ৬৫ = গেলিয়াম ৬৮ + ১টি নিউট্রন।

গেলিয়াম ৬৮ একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে পজিট্রন

বিকিরণের পর এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই এই আইসোটোপটি দস্তা ৬৮তে রূপান্তরিত হল।

সাফল্য! অসামান্য সাফল্য! কলকাতার লবণ-হ্রদে চালু হল পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সাইক্লোট্রন।

সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রচেষ্টায় এবং প্রায় পুরোপুরি ভারতীয় কাঁচামালে এত বড় সাইক্লোট্রন তৈরির ঘটনা ভারতে এই প্রথম। সারা পৃথিবীতে এ ধরনের যন্ত্র আছে আর মাত্র দুটি। দুটিই মার্কিন দেশে। একটি লরেন্স বার্কলে গবেষণাগারে। অপরটি টেকসাস এ অ্যাণ্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজস্থানে শান্তির উদ্দেশ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ করার পর ভাবা পরমাণু গবেষণার তত্ত্বাবধানে তৈরি কলকাতার সাইক্লোট্রন ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ এবং পরমাণু বিজ্ঞানীদের আরও একটি ঐতিহাসিক সাফল্যের নজির স্থাপন করল।

*

সাইক্লোট্রন কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ঃ সাইক্লোট্রন এক ধরনের নিউক্লিয়ার অ্যাকসেলারেটার বা পারমাণবিক ত্বরক যন্ত্র।

অনেকেই হয়ত নানা রকম পারমাণবিক কণার নাম শুনে থাকবেন। যেমন প্রোটন, নিউট্রন, আলফা, প্রভৃতি। প্রোটন পজিটিভ আধান বিশিষ্ট কণা। যে কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যেই এই কণা বাস করে। নিউট্রন আর এক ধরনের পারমাণবিক কণা। এর কোন আধান নেই। তুলনায় আলফা কণার ব্যাপারটা কিন্তু অন্য রকম। এই কণা পেতে গেলে দরকার হিলিয়াম পরমাণু। হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন। আর সেই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে আবর্তন করে দুটি ইলেকট্রন কণা। যাদের মধ্যে থাকে নেগেটিভ চার্জ বা ঋণাত্মক আধান।

ধরুন, বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের চার পাশে আবর্তন রত ওই ইলেকট্রন কণা দুটিকে সরিয়ে নেয়া হল। তখন পড়ে থাকবে শুধু হিলিয়ামের নিঃসঙ্গ নিউক্লিয়াস। যার মধ্যে থাকবে দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন। হিলিয়ামের এই নিঃসঙ্গ নিউক্লিয়াসকেই বলা হয় আলফা কণা। বলা বাহুল্য, একটি প্রোটন কণার চেয়ে একটি আলফা কণার ওজন অনেক বেশী। এবং শুধু হিলিয়াম নিউক্লিয়াস বা আলফা কণাই নয়, অন্যান্য মৌলিক পদার্থেরও পরমাণু থেকে ইলেকট্রনদের সরিয়ে নিয়ে পৃথক পৃথক নিউক্লিয়াস পাওয়া যেতে পারে। আলফা কণার তুলনায় এই সব নিউক্লিয়াস ওজনে আরও ভারী।

প্রোটন, আলফা কণা এবং ওই সব নিউক্লিয়াসের বিজ্ঞানীরা নাম দিলেন পারমাণবিক বুলেট। প্রোটন হাল্কা বুলেট, আলফা তুলনায় ভারী, বেশি

ওজনের মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের বুলেট হবে আরও ভারী। ওঁরা দেখলেন, ওই সব বুলেটের কোন কোনটি দিয়ে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে আঘাত করলে ঘটে নানা রকম ঘটনা। বুলেটের আঘাতে কারোর কারোর নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে গিয়ে তৈরি করে দুটি ভিন্ন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস। কখনও বা এমনও হয়, একটি বুলেট গিয়ে আঘাত করল কোন একটি মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে। মুহূর্তে ওই নিউক্লিয়াসটি বুলেটটিকে বন্দী করে ফেলল। বরং বলি আত্মসাৎ করল। আর এর ফলে তৈরি হয়ে গেল সম্পূর্ণ নতুন একটি মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস। উল্লেখ করা যেতে পারে নতুন এই নিউক্লিয়াসটি পরে ভেঙ্গে গিয়ে ভিন্নতর মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসও তৈরি করতে পারে। যেমন ধরুন, প্রোটন + লিথিয়াম ৭ নিউক্লিয়াস—বেরিলিয়াম-৮ নিউক্লিয়াস।
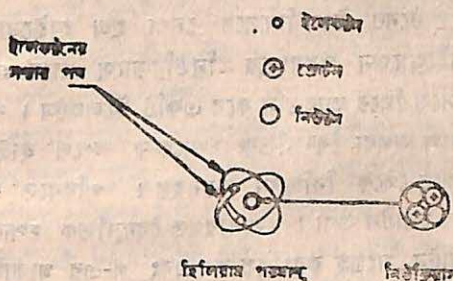
একটি পারমাণবিক বিক্রিয়া

পরে এই বেরিলিয়াম-৮ নিউক্লিয়াসটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙ্গে গিয়ে তৈরি করে দুটি হিলিয়াম-৪-এর নিউক্লিয়াস বা দুটি আলফা কণা। বুলেটের আঘাতে এই ধরনের ভাঙ্গা গড়ার সময় শক্তি হিসেবে বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ বের হয়ে থাকে। পজিট্রন, বিটা, গামা প্রভৃতি বিকিরণ। এই সব ঘটনাকেই বলা হয় নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন বা পারমাণবিক বিক্রিয়া। পারমাণবিক বিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা পদার্থের মৌল চরিত্র সম্পর্কে নানা রকম মৌলিক তথ্য জানতে পারেন। জানতে পারেন কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরির কলাকৌশল। অধিক ফলনশীল ফসলের বীজ তৈরির ব্যাপারে যারা সাহায্য করে, সাহায্য করে দুরারোগ্য ক্যানসার নিরাময়ে, ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে, এবং ইত্যাদি।

*

প্রশ্ন : বুলেটের কথা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু সেই বুলেটের সাহায্যে বিভিন্ন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আঘাত হানতে গেলে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন। বুলেটকে সেই শক্তি যোগাবে কে?

এ ব্যাপারে নানা রকম পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। তৈরি করেছেন নানা রকম যন্ত্র। সাইক্লোট্রন তাদের মধ্যে অন্যতম। এর আবিষ্কর্তা ই ও লরেন্স।

সাইক্লোট্রনের কার্যপদ্ধতি এই রকম।

ধরুন, ক এবং খ দুটি বায়ুশূন্য ধাতব আধার। ধরুন, বুলেট হিসেবে কাজে লাগান হবে প্রোটন। প্রোটনের উৎস হিসেবে নেয়া হল হাইড্রোজেন গ্যাস। অনেকেই জানেন, হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে একটি প্রোটন। আর তার নিউক্লিয়াসকে ঘিরে আবর্তন করে একটি ইলেকট্রন। শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ, প্রচণ্ড উত্তাপ অথবা বৈদ্যুতিক স্পার্কের স্পর্শে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনকে তার পরমাণু থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। পরিবর্তে তখন পড়ে থাকে পজিটিভ আধানযুক্ত প্রোটন কণা। সাধারণত বৈদ্যুতিক স্পার্কের সাহায্যে হাইড্রোজেন থেকে প্রোটন সংগ্রহ করা হয় ক এবং খ-এর মাঝামাঝি একটি জায়গায় (গ)। ক এবং খ জুড়ে দেয়া হয় বৈদ্যুতিক উৎসের সঙ্গে। ধরা যাক 'ক'-এর সঙ্গে জুড়ে দেয়া হল নেগেটিভ বর্তনী এবং খ-এর সঙ্গে জুড়ে দেয়া হল পজিটিভ বর্তণী। ক এবং খ—এদের প্রত্যেকটিকে বলা হয় D। D দুটির তলের ওপরে এবং নিচে লম্বা অবস্থায় রাখা হয় শক্তিশালী চুম্বকের উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু।
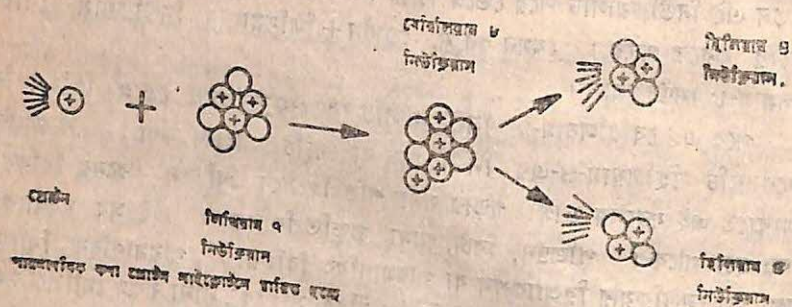
প্রোটন পজিটিভ আধান বিশিষ্ট কণা বলে ধাতব আধার ক তাকে আকর্ষণ করবে। ক নেগেটিভ বর্তণীর সঙ্গে যুক্ত বলে। উচ্চ মাত্রার তড়িৎ বিভবের দরুন সেই আকর্ষণের ফলে প্রোটন তখন প্রচণ্ড গতিতে ক-এর দিকে ধেয়ে যাবে। শুধু ধেয়ে যাবে নয়, আধারের ভেতর ঢুকে পড়বে। এখন ধাতব আধারের বাইরে থাকে বৈদ্যুতিক আধান। তার ভেতরে কোন আধান থাকে না। ফলে আধারের মধ্যে ঢুকে পড়ার পর ওই প্রোটনের ওপর বৈদ্যুতিক প্রভাব থাকে না। থাকে শুধু ধাতব আধার দুটির ওপরে এবং নিচে রাখা দুটি চুম্বক মেরুর প্রভাবে। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে পড়ে প্রোটন কণা তখন বৃত্তাকার পথে সঞ্চারিত হয়ে এগিয়ে যায় 'খ'-এর দিকে। আর যে মুহূর্তে খ-এর সামনে গিয়ে পড়ে একটি অসিলেটারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহের দিকটি পালটে দেয়া হয়। তখন 'খ' হয়ে যায় নেগেটিভ, আর ক হয়ে যায় পজিটিভ।

এবার ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম ঃ প্রোটন গিয়ে সবেগে হাজির হল খ-এর সামনে। আর খ নেগেটিভ বলে প্রচণ্ডভাবে তাকে আকর্ষণ করে বসল। এই আকর্ষণে প্রোটনের বেগ গেল খানিকটা বেড়ে। অর্থাৎ তার ত্বরণ ঘটল। বেগ বাড়ার দরুন প্রোটনের কক্ষপথও হল খানিকটা প্রসারিত। তার বৃত্তাকার পথের ব্যাস বেড়ে গেল।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে বৃত্তাকার পথ ধরে প্রোটন আবার এসে হাজির হল ক-এর সামনে। হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক নেগেটিভে পরিণত হল, খ হল পজিটিভ। ফলে ক আর এক থেপ ত্বরিত হল ক-এর কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে। এই ভাবে পর্যায় ক্রমে প্রোটন যতবার একটি D থেকে আর একটি D-এ প্রবেশ করল প্রতিবারেই তার বেগ কিছু না কিছু পরিমাণ বাড়তে লাগল। এবং অবশেষে প্রচণ্ড বেগে তাকে যখন একটি দ্বার পথের (ঘ) বাইরে নিয়ে আসা হল, দেখা গেল ততক্ষণে তার বেগ দারুণ বেড়ে গেছে। দ্বারপথের সামনে কোন পদার্থ রেখে দিলে তখন সে প্রচণ্ড শক্তিতে তাকে গিয়ে আঘাত করবে। আঘাতের ফলে ঘটবে পারমাণবিক বিক্রিয়া। ঠিক এইভাবে আলফা কণিকাকেও বুলেট হিসেবে কাজে লাগান হয়। সংক্ষেপে এই হল সাইক্লোট্রনের কার্যপদ্ধতি।

*

লরেন্স তাঁর নিজের তৈরি সাইক্লোট্রনের সাহায্যে পারমাণবিক গবেষণায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করার পর পৃথিবীর বেশ কয়েকটি গবেষণাগার এই যন্ত্র তৈরির ব্যাপারে এগিয়ে আসেন।

এগিয়ে এসেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও। তখন ১৯৪০-এর দশক শুরু হয়েছে। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বললেন, আমরাও তৈরি করব সাইক্লোট্রন।

শুরু করলেনও। বিদেশ থেকে একমাত্র চুম্বকটি নিয়ে আসা ছাড়া সাইক্লো-ট্রনের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম তৈরি করার ব্যবস্থা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই বিজ্ঞান কলেজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিক সাহায্য করল। গড়ে উঠল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস। এখন যার পরিচয় সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার সহকারী হিসেবে এগিয়ে এলেন ডঃ বাসন্তী দুলাল নাগ চৌধুরী, ডঃ ধীরেন্দ্র-নাথ কুণ্ডু, ডঃ এ পি পাত্র, প্রমুখ কৃতী বিজ্ঞানীরা। সাফল্যের সঙ্গে একদিন সত্যি সত্যিই তাঁরা তৈরি করলেন সাইক্লোট্রন। প্রথম ভারতীয় সাইক্লোট্রন। কলকাতার লবণ-হ্রদ উপনগরীতে সদ্য তৈরি যন্ত্রটির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সারা ভারতে এটাই ছিল একমাত্র সাইক্লোট্রন। মৌলিক গবেষণার ব্যাপারে এই যন্ত্রটি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

*

'লবণ হ্রদের সাইক্লোট্রন একটি বড় রকমের চ্যালেঞ্জ।' একবার কথা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের ডাইরেকটার এবং বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ রাজা রামান্না। 'কলকাতার বিজ্ঞানীরা সাইক্লোট্রন তৈরির ব্যাপারে আগেই ঐতিহ্য রচনা করেছেন। অতএব শক্তিশালী সাইক্লোট্রন যন্ত্র যদি সত্যিই বসাতে হয়, তা হলে সেটা বসবে কলকাতায়।' এটাও ডঃ রামান্নার আর একটি মন্তব্য।

ঠিক হল বিদেশ থেকে ন্যূনতম আমদানি হবে। যাবতীয় সাজসরঞ্জাম দেশেই তৈরি করতে হবে। ঠিক হল, দেশের সরকারী এবং বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে এ কাজে ভূমিকা নিতে হবে। লরেন্স বার্কলে গবেষণাগারের ৮৮ ইঞ্চি সাইক্লোট্রন এবং টেকসাস এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইক্লোট্রনকে অবলম্বন করে তৈরি হল ব্লু-প্রিন্ট।

কিন্তু বাধা অনেক। ২৬২ টন ওজনের বৈদ্যুতিক চুম্বক চাই। দেশে এত বড় বৈদ্যুতিক চুম্বক তৈরির মত লোহা আগে কখনও ঢালাই হয়নি। আর সে কি যে সে লোহা? বিশেষ ধরনের লোহা। আমাদের ধাতু বিজ্ঞানীদের এ ধরনের লোহা ঢালাই করার মত অভিজ্ঞতাও ছিল না। এগিয়ে গেলেন ট্রম্বে এবং কলকাতার বিজ্ঞানীরা। হাত মেলালেন রাঁচি হেভি ইনজিনিয়ারিং করপোরেশনের সঙ্গে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলল আলোচনা। নমুনা পরীক্ষা। অবশেষে এই প্রতিষ্ঠান দৈত্যাকার সেই চুম্বকটি তৈরিও করল। জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, 'আমাদের এই চুম্বকের মান মার্কিন দেশের সাইক্লোট্রনের চুম্বকের চেয়ে অনেক উঁচু।'

এগিয়ে এল ভূপালের ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড। চুম্বকের কয়েলের জন্যে এঁরা তৈরি করলেন বিশেষ ধরনের তামার পরিবাহী। যার ভেতরে আছে ছিদ্র। যন্ত্রটি চালু থাকার সময় ওই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা জলের প্রবাহ চলবে। যাতে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক প্রবাহে কয়েল গরম হয়ে না ওঠে। ট্রম্বের ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের ওয়ার্কশপে তৈরি হল ভ্যাকুয়াম যন্ত্র, ডিফিউশন পাম্প। রিজনেটার ট্যাঙ্ক তৈরি করলেন গার্ডেনরীচ শিপ বিল্ডারস।

সাইক্লোট্রনের মূল বাড়ির পাশে উঠছে সাহা ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকসের নতুন গবেষণাগার। এই যন্ত্রটিকে কেন্দ্র করে মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে সেখানে।

২২৪ সেন্টিমিটারের এই সাইক্লোট্রনটি তৈরি করতে মোট খরচ হয়েছে প্রায় ৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিদেশ থেকে যৎসামান্য সাজসরঞ্জাম আনতে খরচ পড়েছে ১ কোটি টাকার মত। এই যন্ত্রে ১৩০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির আলফা কণা তৈরি করা যাবে। যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য, এর সাহায্যে প্রোটন, ডয়েটরণ এবং আলফা কণার শক্তি প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

*

সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি চালু হওয়ার পর এই প্রকল্পের পরিচালক সি অম্বাশঙ্করণের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি বললেন, আমাদের এই যন্ত্র আগামী তিন মাসের মধ্যে পুরোদস্তুর চালু হয়ে যাবে। তার জন্যে আমাদের বিজ্ঞানী, ইনজিনিয়ার এবং কুশলীরা দিন রাত পরিশ্রম করে চলেছেন। এই যন্ত্রটি তৈরি করতে গিয়ে তাঁরা প্রচুর অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন। এটাও আমাদের একটা বড় রকমের লাভ।
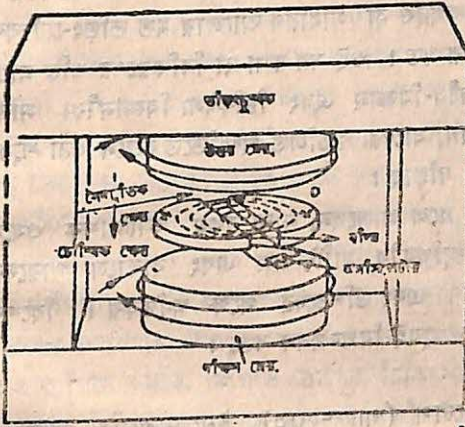
অম্বাশঙ্করণ বললেন, কলকাতার ছেলেরা প্রচণ্ড বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী। এই যন্ত্রটি চালু করার জন্যে গত মার্চ থেকে সপ্তাহে ছয় দিন তাঁরা যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন তার তুলনা হয় না।

তিনি বলেন, পুরোপুরি রুটিন মাফিক কাজ শুরু হওয়ার পর দেশের যে কোন গবেষক প্রয়োজনে এখান থেকে সাহায্য পাবেন। এ ছাড়া নানা রকম তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হবে এখানে। যা কৃষি গবেষণা থেকে শুরু করে সারা পূর্বাঞ্চলের ওষুধ শিল্প, চিকিৎসা এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

*

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে, কলকাতার এই সাইক্লোট্রন মানব কল্যাণে কতটা লাভজনক হবে? একথা ঠিক, শক্তিশালী এই যন্ত্রে বুলেট হিসেবে বিজ্ঞানীরা নানা রকম পারমাণবিক কণা ব্যবহার করতে পারেন। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গায়ে আঘাত ঘটিয়ে পদার্থের গঠন, বিচিত্র রকমের পারমাণবিক বিক্রিয়া প্রভৃতির উপর আধুনিকতম পর্যায়ে মৌল গবেষণা চালানর ক্ষেত্রে এ যন্ত্র যে যথেষ্ট সাহায্য করবে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রত্যক্ষভাবে যাকে আমরা মানব কল্যাণমূলক কাজ বলে অভিহিত করে থাকি, সে কথা ধরলে এই মুহূর্তে অন্তত এটুকু বলা চলেঃ কলকাতার এই সাইক্লোট্রন ব্যাপক হারে নানা রকম তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরী করতে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রচুর সাহায্য করবে। মানুষের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে যাদের ভূমিকা এখন কেউই আর অস্বীকার করতে পারেন না। বিশেষ করে

জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে তো বটেই।

পদ্ধতিটি খুবই সহজ। যে কোন তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বেরিয়ে আসে শক্তি। কখনও পারমাণবিক কণা, যেমন, ইলেকট্রন, আলফা, বিটা প্রভৃতি হিসেবে। কখনও বা সাধারণ আলোর মত তড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণ, যেমন গামা রশ্মি প্রভৃতির মত। ওই সব কণা বা বিকিরণের শক্তি মাত্রা বা বিস্তারের কায়দাকানুন দেখে জীব-বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা নানা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন, যাদের প্রচলিত পদ্ধতিতে জেনে ওঠা শুধু দুষ্করই নয়, কখনও অসম্ভবও হয়ে দাঁড়ায়।

যেমন ধরুন, ইদানিং অনেকেই বলে আসছেন, নানা রকম কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতির যথেচ্ছা ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর মাটি, জল এবং বাতাসে পারদের মাত্রা বেড়ে গেছে। এই পারদ প্রাণী এবং উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর। বিশেষ করে শিশু এবং ভ্রূণের পক্ষে পারদ খুবই বিপজ্জনক বস্তু।

প্রশ্ন এই, কতটা বিপজ্জনক?

পারদের তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ (পারদ-২০৩) ইনজেকশনের সাহায্যে গর্ভবতী ইঁদুরের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, মা-ইঁদুরের মস্তিষ্কের চেয়ে ভ্রূণের মস্তিষ্কে পারদ গিয়ে জমে অনেক বেশি মাত্রায়। কীভাবে জানা গেল? ওই আইসোটোপ শরীরে যেখানে গিয়ে হাজির হয়, সেখান থেকে তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ বের হতে থাকে। বের হয়ে শরীরের বাইরে চলে আসে। সংবেদনশীল যন্ত্রের সাহায্যে বিকিরণ মেপে বলে দেয়া যায় ওই পদার্থটি শরীরে কোথায় গিয়ে জমে, কতটা জমে এবং কতক্ষণ ধরে জমে থাকে। কারণ, বিকিরণ যদি পরে ধরা না পড়ে, বুঝতে হবে বস্তুটি শরীরের ওই বিশেষ জায়গা থেকে সরে পড়েছে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, প্ল্যাসেণ্টা বা ফুলের আস্তরণ ভেদ করেও পারদ ভ্রূণের মস্তিষ্কে গিয়ে পেঁছতে পারে। এবং বয়স্কের মস্তিষ্ক কোষের যতটা না ক্ষতি করতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারে ভ্রূণের মস্তিষ্ক কোষের।

অথবা ধরুন তেজষ্ক্রিয় হাইড্রোজেন (হাইড্রোজেন-৩) ট্রিটিয়ামের কথা। ইদানীং ট্রিটিয়াম ঘটিত রাসায়নিক যৌগ থাইমিডিন (thymidine)-এর সাহায্যে জীবন সৃষ্টির মৌল কণিকা ডি এন এ-র সংশ্লেষণ নির্ধারিত করা হচ্ছে। শরীরে কি কি ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড কতটা পরিমাণ তৈরি হয়ে থাকে সে সব ব্যাপারেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন নানা দেশের বিজ্ঞানীরা।

শরীরের erythropoietin নামে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগের পরিমাণ জেনে নেবার ব্যাপারেও তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপের ভূমিকা যেন অদ্বিতীয়ের। রক্তে লোহিত কণার উৎপাদন বাড়ানর ক্ষেত্রে বিশেষ এই যৌগটি যথেষ্ট সাহায্য করে। পরীক্ষার জন্যে বস্তুটিকে প্রস্রাব থেকে সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু মুশকিল

এই, প্রচলিত রাসায়নিক পদ্ধতিতে এর পরিমাপ বের করা এখনও সম্ভব হয় নি। সম্ভব হয়েছে একমাত্র লোহার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের (লোহা-৫৯) সাহায্যে।

নতুন কোন ওষুধ তৈরি হল। এই ওষুধ শরীরে ঠিক কোন কোন জায়গায় গিয়ে পেঁছয় এবং কতক্ষণ ধরে কাজ করে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে তা জানা যায়। অপুষ্টির দরুন কেউ রক্তাল্পতায় ভুগছে। কী ধরনের খাবার খেলে লোহার অভাবজনিত রক্তাল্পতা দূর করা যায় ইদানীং তাও জানা যাচ্ছে তেজস্ক্রিয় লোহা-৫৯-কে কাজে লাগিয়ে।

অভিযোগ, জন্মনিরোধ ওষুধ খাওয়ার ফলে কোন কোন মহিলা বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। এর কারণ কী? তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ আইসোটোপ কাজে লাগিয়ে এ প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া গেছে।

রক্তের প্রবাহমাত্রা, শরীরের কোন কোন অঞ্চলে জল, প্রোটিন, লবণ, অম্ল এবং খার গিয়ে জমছে, গলগণ্ড রোগের চিকিৎসা, ক্যানসার নিরাময় বা প্রতি রোধ, শল্য চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম নির্জীবাণুকরণ, হৃদরোগীর হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক রাখার জন্যে পেসমেকার নামে যে যন্ত্র কাজে লাগান হয়, সেই যন্ত্রটি চালু রাখার মত শক্তি সরবরাহ, অথবা বিকিরণের সাহায্যে উচ্চফলনশীল বীজ তৈরী থেকে শুরু করে বীজ এবং খাদ্য সংরক্ষণ—সব ব্যাপারেই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ভূমিকা।

গত কয়েক বছর ধরে ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র নানা রকম আইসোটোপ তৈরি করে আসছে। চিকিৎসা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যে ওই গবেষণা কেন্দ্র ইতিমধ্যে আইসোটোপ ঘটিত প্রায় ৫৪টি ওষুধ তৈরি করেছে। ওষুধগুলি ভারতের বিভিন্ন গবেষণাগার কাজে লাগাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, কলকাতার সাইক্লোট্রন নানা রকম আইসোটোপ তৈরি করবে। এই সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কলকাতা এবং ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে কাজে লাগান যেতে পারে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষকও সহজে এখান থেকে প্রয়োজন মত আইসোটোপ সংগ্রহ করে কাজ চালাতে পারবেন।

ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র যতটা উৎপাদন করছে চাহিদার তুলনায় তার পরিমাণ যথেষ্ট নয়। এছাড়া সাইক্লোট্রোনের সাহায্যে কয়েকটি বিশেষ ধরনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরির সুবিধেও অনেক। অতএব কণা পদার্থের ওপর মৌলিক এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা ছাড়াও মানব কল্যাণে কলকাতার সাইক্লোট্রোনটির ভূমিকা অনেক বিশদ এবং ব্যাপক হবে।

পথ চলতে চলতে নিছক অন্যমনস্কতার দরুনই লোকটি গাড়ি চাপা পড়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে আসার পর দেখা গেল সে সম্পূর্ণ অচৈতন্য। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখলেন, শরীরের নানা জায়গায় সে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। বিশেষ করে বাঁ পাশের মূত্রাশয়টি পুরোপুরি অকেজো।

জনৈক শল্য চিকিৎসক বললেন, ওঁর বাঁ পাশের মূত্রাশয়টি এক্ষুনি কেটে সরিয়ে ফেলা দরকার।

দাঁড়ান। মন্তব্য করলেন জনৈক বিশেষজ্ঞ। তিনি বললেন, সেটা করার আগে দেখে নেওয়া দরকার, ওর ডান পাশের মূত্রাশয়টি এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কী না। দেখা দরকার, সেটি স্বাভাবিকভাবে কাজ করার ক্ষমতা রাখে কী না। নইলে আপনি যা করতে চাইছেন, তার অর্থ লোকটিকে আরও তড়িঘড়ি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া।

কিন্তু মুশকিল এই, চটপট ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। যদি সত্যিই ডান পাশের মূত্রাশয়টি স্বাভাবিক আছে কী না দেখতে হয়, মিনিট পনেরর মধ্যেই সেটা করে নেওয়া দরকার।

লোকটির ভাগ্য ভাল। যে হাসপাতালে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানে তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ মাপার একটি যন্ত্র ছিল। চিকিৎসকরা যন্ত্রটিকে তার পিঠের ওপর স্থাপন করলেন। এমনভাবে, যাতে করে মূত্রাশয় থেকে বেরিয়ে আসা বিকিরণ যন্ত্রটি ধরতে পারে। এরপর ডাক্তাররা তার ধমনীর মধ্যে বিশেষ এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দিলেন। যার মধ্যে ছিল তেজষ্ক্রিয় আইওডিনের পরমাণু। রক্ত সেই তেজষ্ক্রিয় আইওডিন ঘটিত রাসায়নিক যৌগটিকে এক মিনিটের মধ্যেই মূত্রাশয়ে পৌঁছে দিল। এর অর্থ এক মিনিট পর সেখান থেকে তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের আবির্ভাব।

বিশেষজ্ঞরা জানতেন, মূত্রাশয় যদি স্বাভাবিকভাবে কাজ করার ক্ষমতা রাখে তাহলে ওই বিকিরণের মাত্রা প্রায় চার মিনিট ধরে ধাপে ধাপে বেড়ে যাবে। তারপর হঠাৎ কমে যেতে শুরু করবে অতি দ্রুত। কারণ ওই সময়ের পরই মূত্রাশয় ইকজেকট করা রাসায়নিক বস্তুকে শুষে নিয়ে শরীরের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থাটি সেরে ফেলার কাজে ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু, মূত্রাশয় অকেজো হয়ে পড়লে বিকিরণের কাজ তেমন বেশি বাড়বে না, আবার তত তাড়াতাড়ি কমবেও না। আহত লোকটির ক্ষেত্রে দেখা গেল, তার ডান পাশের মূত্রাশয় তখনও স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চিকিৎসকদের সময় লাগল মাত্র দশ মিনিট। না, একটি নয় এমন অনেক উদাহরণ পৃথিবীর বহু হাসপাতালেই এখন পাওয়া যাবে। কারণ তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ বা

বা রেডিও আইসোটোপের সাহায্যে রোগনির্ণয় এখন প্রায় রুটিন ব্যবস্থার মত।
কার্যক্ষমতা অনুযায়ী চিকিৎসকরা এক এক ধরনের তেজষ্ক্রিয় পদার্থের যৌগ
সাধারণ ওষুধের মতই রোগীকে খেতে বলেন অথবা তার শরীরে ইনজেকশনের
সাহায্যে ঢুকিয়ে দেন। রক্তের মধ্যে দিয়ে সেই যৌগ শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে
পড়ে। যেখানে যায়, সেখান থেকে বিকীর্ণ হয় তেজষ্ক্রিয় রশ্মি। সেই
রশ্মির মাত্রা, বিকিরণের সময়, কতক্ষণ ধরে বিকীর্ণ হচ্ছে এবং কী ভাবে, সে
দেখে, বিশেষজ্ঞর যকৃৎ, রক্তের অবস্থা, এমন কি মস্তিষ্কের গভীরে কোথাও কোন
গোলমাল দানা বেঁধেছে কী না, সে সম্পর্কে নানান তথ্য জানতে পারেন। তাঁদের
কাছে চিকিৎসার ব্যাপারটা তখন সহজতর হয়। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, আপনারা
অনেকেই হয়ত জানেন, একমাত্র হাইড্রোজেন ছাড়া, প্রত্যেক মৌলিক পদার্থেরই
নিউক্লিয়াস বা পরমাণু কেন্দ্রে থাকে দু রকমের কণিকা। প্রোটন এবং নিউট্রন।
প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎধর্মী কণিকা এবং নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণিকা। পরমাণু
কেন্দ্রের চার পাশে আবর্তন করে ঋণাত্মকধর্মী ইলেকট্রন কণা। অদ্ভুত ব্যাপার
এই, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই মৌলিক পদার্থ কিন্তু তার একাধিক পর-
মাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সংখ্যা সমান, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন।
এ-ধরনের পরমাণুগুলিকেই বলা হয় আইসোটোপ বা সমস্থানিক পদার্থ। যে
সমস্ত আইসোটোপ তেজষ্ক্রিয় পদার্থ বিকীর্ণ করে তাদের বলা হয়, রেডিও
আইসোটোপ।

যেমন ধরুন, আইওডিন। সাধারণ আইওডিনের একটি পরমাণু একটি
হাইড্রোজেনের পরমাণু থেকে ১২৭ গুন ভারি। এটি চিরস্থায়ী মৌলিক পদার্থ।
কিন্তু এই আইওডিনেরই আবার কোন কোন অণুর ভর ১২৭ থেকে কিছুটা বেশি,
অথবা কম। শেষোক্ত এই আইওডিনের কোন কোনটি কয়েক সেকেন্ড বা ঘণ্টার
মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তেজষ্ক্রিয় রশ্মি বিকীর্ণ করে ভিন্নতর মৌলিক পদার্থে
পরিবর্তিত হয়ে যায়। আবার কোন কোন আইওডিন, যেমন আইওডিন—১২৫
এবং আইওডিন—১৩১-এর ক্ষেত্রে এ-ধরনের রূপান্তর হতে সময় লাগে
কয়েক দিন অথবা সপ্তাহ। চিকিৎসার ব্যাপারে অথবা শারীরিক কোন পরীক্ষা-
নিরীক্ষা চালানোর জন্য বিজ্ঞানীরা সচরাচর এ-ধরনের আইসোটোপই ব্যবহার
করেন বেশি।

অবশ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বল্পজীবী তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপই কাম্য।
কারণ, শরীরের মধ্যে বেশিক্ষণ বিকিরণ চললে, রোগীর ক্ষতি হওয়ার
সম্ভাবনা থাকে বেশি। স্বল্পজীবী তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ পেতে গেলে
হাসপাতাল বা পরীক্ষাগারকে কোন পারমাণবিক চুল্লির কাছাকাছি
থাকতে হবে। অথবা কাছাকাছি অঞ্চলে সাইক্লোট্রনের মত কোন যন্ত্র থাকা
দরকার। কারণ, সাধারণ স্থায়ী কোন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে

এ-ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে পারমাণবিক কণার আঘাত ঘটিয়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা হয়। যেমন ধরুন, আইওডিন—১৩২। তৈরি করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ত্যাগ করে এই বস্তুটি ভিন্নতর মৌল কণায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। অতএব দরকার হলে এক জায়গায় তৈরি আইওডিন—১৩২-কে যে আপনি দূরের কোন হাসপাতাল বা গবেষণাগারে কাজ চালানর জন্য চালান করলেন, তার কোন উপায় নেই। বরং টেলুরিয়াম—১৩২ নামে আর এক ধরনের আইসোটেপের সাহায্যে এ কাজটি আপনি সারতে পারেন। কারণ, এ বস্তুটির বিকিরণের মাধ্যমে রূপান্তরিত হতে সময় লাগে বেশ কয়েক দিন। এবং রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হয় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আইওডিন—১৩২-এ। এক্ষেত্রে সুবিধেটা এই, সাইক্লোট্রন বা অনুরূপ কোন পদ্ধতিতে এক জায়গায় আপনি টেলুরিয়ম—১৩২ তৈরি করলেন। তারপর চালান দিন দূরের কোন হাসপাতাল বা গবেষণাগারে। পথে যেতে যেতে টেলুরিয়াম—১৩২ রূপান্তরিত হতে থাকবে আইওডিন—১৩২-এ। কার্যস্থলে গিয়ে দেখবেন, যতটা আইওডিন—১৩২-এর দরকার, প্রস্তুত হয়ে গেছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দুটি কারণে বহুল ব্যবহার করছেন। এক, শারীরবৃত্তীয় কাজকর্ম ঠিকমত চলছে কি না সে সম্পর্কে জানা। দুই, গোড়ায় মূত্রাশয় পরীক্ষা করার যে ব্যাপারটি উল্লেখ করেছি, অনুরূপ কোন পরীক্ষা চালান।

রোগ-নির্ণায়ক আইসোটোপ

ধরুন, কেউ হয়ত রক্তাল্পতায় ভুগছেন। রক্তবাহী নলের মধ্যে কোথাও রক্তক্ষরণের ফলেই হয়ত তাঁর শরীরে রক্তাল্পতা দেখা দিচ্ছে। বাইরে থেকে এ-ব্যাপারটা কী করে বুঝবেন?

হ্যাঁ, ওই একই পদ্ধতি। তবে এবার আর আইওডিন নয়, লোহার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আয়রন—৫৯ দ্রবনের মাধ্যমে রোগীর ধমনীর মধ্যে ইনজেকশনের সাহায্যে ঢুকিয়ে দিন। ওই আইসোটোপ রক্তের লোহিত কণা হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে গিয়ে মিশবে এবং বিভিন্ন শিরা-উপশিরার মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে ছড়িয়ে পড়বে রোগীর সারা দেহে। যেন রোগীর সারা দেহটিই তখন তেজস্ক্রিয়। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির ক্ষেত্রে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ওই তেজস্ক্রিয়তা হ্রাস পাবে।

কিন্তু শিরা-উপশিরা অথবা কৈশিক নলের কোন অঞ্চলে যদি সত্যিই রক্তক্ষরণ হয়, তখন সেই জায়গা থেকে কিছুটা পরিমাণ করে আয়রন-৫৯ বেরিয়ে যেতে থাকবে। ফলে রোগীর সারা দেহের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা দ্রুত কমে যেতে থাকবে। এক্ষেত্রে সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা হল, রোগীকে পুরোপুরি বাকসের

মত একটি আচ্ছাদনের মধ্যে রেখে দিন। যাতে করে বাইরে থেকে প্রাকৃতিক কোন তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ তার শরীরের উপর গিয়ে না পড়তে পারে। বাকসের মধ্যে থাকবে তেজষ্ক্রিয়তা মাপার যন্ত্র। এ-ধরনের ব্যবস্থায় কম পরিমাণ আয়রন—৫৯ ব্যবহার করেই ভাল ফল পাওয়া যায়। একটা কথা বলা দরকার, চিকিৎসকরা এ-ধরনের ব্যবস্থাপনায় সাধারণত সেই সব আইসোটোপই কাজে লাগান যা সচরাচর বিটা অথবা গামা রশ্মি বিকীর্ণ করে। অবশ্য গামা রশ্মির প্রয়োজনীয়তাই বেশি। কারণ এই রশ্মি দেহের অস্থি এবং পুরু গাত্রত্বক ভেদ করেও বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে।

ফুসফুসের কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে চলছে কী না, সেটা পরীক্ষা করার জন্য কখনও কখনও কোন তেজষ্ক্রিয় পদার্থের গ্যাসও কাজে লাগান হয়। যেমন ধরুন জেনন—১৩৩। এটি অত্যন্ত ভারী গ্যাস। ফুসফুসের মধ্যে দিয়ে ঠিকমত হাওয়া বাতাস চলাচল করতে পারছে কি না অথবা শ্বাস প্রশ্বাসের দরুন রক্তে ঠিকমত অকসিজেন বা কারবন ডাই-অকসাইড মেলামেশা করতে পারছে কি না, তেজষ্ক্রিয় জেনন—১৩৩ সহজেই তা আবিষ্কার করতে পারে। যেটুকু করা দরকার সেটা হল, রোগী জেনন—১৩৩ মেশানো বাতাস প্রশ্বাসের সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্য গ্রহণ করবেন। তাঁর বুকের চারপাশে তখন লাগান থাকবে তেজষ্ক্রিয়তা মাপক যন্ত্র। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করুন। ফুসফুসের কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক তথ্যই ধরা পড়বে।

কখনও কখনও স্যালাইন বা সাধারণ লবণের দ্রবনের মধ্যে জেনন—১৩৩ মিশিয়ে দিয়ে যে ধমনী ফুসফুস রক্ত সরবরাহ করে, তার ভিতর ওই দ্রবণ ইনজেকশনের সাহায্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফুসফুসে যাওয়ার পর রক্ত থেকে বেরিয়ে এসে তার সবটা তখন গিয়ে মেশে ফুসফুসের ভিতরকার বাতাসে। রোগীকে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ করতে বলা হয়। আর ওই সীমিত সময়ের মধ্যেই পরীক্ষা করে দেখা হয়, ফুসফুসে রক্ত চলাচল ব্যবস্থাটি ঠিক মত চলছে কি না অথবা রক্তের মধ্যেকার গ্যাসীয় উপাদানগুলি যথাযথ তাল রেখে চলছে কি না। বলা বাহুল্য, শুধু ফুসফুসই নয়, শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটলেও জেনন—১৩৩-এর সাহায্যে তা ধরা যেতে পারে। যেমন ধরুন, যে করোনারি শিরাটি হৃদপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ করছে অথবা 'ইনটারনাল ক্যারোটিড আরটারি' নামক যে শিরাটি মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করে থাকে—ঠিকমত তাদের মধ্যে রক্ত চলাচল হচ্ছে কি না যদি জানতে চান, ওই সমস্ত শিরার মধ্যে তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ ইনজেকট করুন, ধরা পড়বে। রক্ত চলাচল যদি স্বাভাবিকভাবে চলে, দেখবেন তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ সহজেই ওই শিরার মধ্যে গিয়ে হাজির হবে, তেজষ্ক্রিয়তা বাড়বে এবং অল্প সময়ের মধ্যে কমবেও। কিন্তু সত্যিই যদি রক্ত চলাচলে কোন বাধা

থাকে, তাহলে এ-ধরনের কাজ করতে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ সময় নেবে অনেক বেশি।

শরীরে কোথাও টিউমার গড়ে উঠছে কি না, সে সম্পর্কে বিশদ বিবরণ যোগানোর ব্যাপারেও তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপের ভূমিকা অপরিসীম। অনেকেই হয়ত জানেন, সাধারণ দেহকোষের চেয়ে টিউমারের কোষ খুব কম সময়ে বেড়ে যায় এবং বিভাজিত হতে থাকে। তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ এ-ব্যাপারটিকে বিশেষজ্ঞদের কাছে খুব সহজেই পরিষ্কার করে তুলে ধরতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও বিশেষ করে মস্তিষ্কে যদি কারোর টিউমার হয়, তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে তার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা এখন সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাড়ের ভিতরকার টিউমার সম্পর্কিত খবর জানার ব্যাপারে কাজে লাগান হয় ফ্লুওরিন—১৮। এবং এক সময়ে প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয়ের রোগ নির্ণয়ে যে সমস্ত জটিল বাধা ছিল, সে বাধা এখন ভেঙে গেছে। অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঙ্গে সেলেনিয়াম—৭৫ নামক তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ মিশিয়ে আগের মত পদ্ধতিতেই অগ্ন্যাশয়ের রোগ নির্ণয় এখন সহজতর হয়েছে।

মরুভূমির বাইরের চেহারাটা যত রুক্ষই হক না কেন, তার গভীর ভূস্তরের বহু অঞ্চল যথেষ্ট সিক্ত। অনেকের অনুমান, সাহারার বহু অঞ্চল জলের উপর ভাসছে। প্রচুর জল। সেই জল উদ্ধার করা গেলে রুক্ষ সাহারার বুকে হয়ত সবুজের বন্যা ঘটান যেত। এ কথা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মরুভূমির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভারতের থর মরুভূমির ক্ষেত্রেও। সমস্যা এই, মরুভূমির ভূস্তরের গভীরে জল আছে এ কথা জানা সত্ত্বেও মানুষের কাছে সেই জলের উৎস বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সহজলভ্য নয়। বরং বলি, নাগালের বাইরে। ভূগর্ভে বন্দী এই সঞ্চিত জল সম্পর্কে কতটুকু আমরা জানি? যেখানে বৃষ্টিপাত নেই বললেই চলে এমন জায়গায় ভূস্তরে কী ভাবে সঞ্চিত হল অত জল? কখনই বা হল? এমন অনেক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সন্ধানের জন্যে দীর্ঘকাল গবেষণা করে আসছেন বিজ্ঞানীরা। এ কাজে বিভিন্ন পদ্ধতি কাজে লাগান হয়েছে। তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ পদ্ধতি তাদের অন্যতম "সাহারায় জলের পরিমাণ কত, সে জল কতটা আমরা চাষের কাজে ব্যবহার করতে পারি, সেটা জানাই আমাদের মূল লক্ষ্য এখন। সাহারার অভিজ্ঞতা পরে অন্যত্রও আমরা কাজে লাগাতে পারব।" সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার 'আইসোটোপ হাইড্রোলজি সেকশন'-এর সদস্য আর গনিফিয়ানতিনি।

মরুভূমির সংজ্ঞা কি?

মরুভূমি বলতে সেই সব অঞ্চলকেই বোঝায় যেখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই নগণ্য। ঊষর প্রান্তর। কোথাও পাহাড়। সে পাহাড় শুধু পাথরের স্তূপ। এক টুকরো ঘাসও সেখানে জন্মায় না। অথবা বালির সমুদ্র। তরঙ্গায়িত বালিয়াড়ি। ফাঁকে ফাঁকে মনসা বা রুক্ষ ঘাসের ফাঁকা বন। মানুষের স্থায়ী বসতির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বৃষ্টি যদি পড়েও তার পরিমাণ বছরে ২৫০ মিলিমিটারের বেশী নয়। তাও সর্বত্র নয়। শুধু বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে। এমন অঞ্চলও আছে যেখানে বছরের পর বছর এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে না। এ ধরনের অঞ্চলকে বলা হয় Hyperarid desert বা অতি মরু অঞ্চল। সেখানে না আছে পুকুর বা জলের মত জলাশয়, অথবা নদী। ভূগর্ভস্থ জল থাকলেও তা ভূস্তরের এত গভীরে, শেকড় বাড়িয়ে সেই জল যে গাছপালা সংগ্রহ করবে তার জো নেই। সে জল নলকূপেরও নাগালের বাইরে। তাই মরুভূমিতে স্থায়ীভাবে কোন গাছপালা অথবা প্রাণী জীবন ধারণ করতে পারে না। মানুষের বাসভূমি গড়ে উঠলেও তা বিক্ষিপ্ত এবং সংখ্যায় কম। একমাত্র মরূদ্যানেই অবশ্য সেটা সম্ভব। মরূদ্যানে মরুভূমির স্থলভাগ নিচের দিকে ঢালু। শুষ্ক হ্রদের মত। সেই ঢাল ভূস্তরে বন্দী জলস্তরের কাছাকাছি

নেমে যায়। কোথাও বা নামে জলস্তর পর্যন্ত। এর ফলে ওই সব অঞ্চলে নলকূপ অথবা কুয়ো খুঁড়ে জল সংগ্রহ করা যায়। সেই জল পান এবং সেচের কাজে লাগিয়ে—আদিম পদ্ধতিতে—কিছু মানুষ কোন রকমে জীবন ধারণ করে।

বেশির ভাগ মরুভূমি গড়ে উঠেছে নিরক্ষ রেখার উত্তর এবং দক্ষিণে—১৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি অক্ষাংশের মাঝবরাবর। এই সব মরুভূমির মধ্যে বৃহত্তম উত্তর আফ্রিকার সাহারা। যার বিস্তৃতি ৯০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। প্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান। অন্যান্য বৃহত্তর মরুভূমির মধ্যে পড়ে আরব উপদ্বীপ এবং ইরানের মরুভূমি। অনেকের মতে এক সময়ে এরা সাহারারই অংশ ছিল। এ ছাড়া আছে সোভিয়েত দেশের তুর্কিস্তান, ভারতের থর, চীন এবং মঙ্গোলিয়ার গোবি এবং আমেরিকার বৃহৎ মরুভূমি। দক্ষিণ গোলার্ধে বড়সড় মরুভূমির মধ্যে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি, গ্রেট অস্ট্রেলিয়ান ডেজার্ট এবং চিলির উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত আতাকামা মরুভূমি। শেষোক্ত এই মরুভূমিটি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এটিই পৃথিবীর শুষ্কতম মরুভূমি। গত একশ' বছরে এখানে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়েনি।

বলা বাহুল্য, অঞ্চল বিশেষে পৃথিবীর আবহাওয়ার বারবার পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর যে সব অঞ্চল এখন মরুভূমি চিরকাল তারা যে সেরকমই ছিল এ কথাও ঠিক নয়। কোন না কোন সময় সে সব অঞ্চলে বৃষ্টি হত। বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদের সেখানে ছিল বাড়ন্ত। সাহারার পাহাড় পর্বতের গায়ে প্রাচীন মানুষের আঁকা ছবির সন্ধান দিয়েছেন পুরাতাত্ত্বিকরা। সে সব ছবি দেখে মনে হয় সাহারার আবহাওয়া এক সময় ছিল অনুকূল। মানুষের বাসোপযোগী। সেখানে বৃষ্টি পড়ত প্রচুর। জলের অভাব ছিল না। সেখানে এই ঘটনা শেষবারের মত যে যে সময়ে ঘটেছিল ভূতাত্ত্বিকরা তার নাম দিয়েছেন Pluvial যুগ। তখন বর্ষা ঝরত অঝোরে। তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা ছিল কম। পৃথিবীর অন্যত্র যখন বরফযুগ চলছে ওই সব অঞ্চল তার আওতার বাইরে ছিল। এবং এই ঘটনা ৭000 থেকে ৩000 বছর পর্যন্ত চলে।

এর পর অবস্থার অবনতি ঘটে। ভূস্তরের উপর সঞ্চিত জল—পুকুর হ্রদ, নদীনালা—ক্রমে শুকিয়ে যায়। প্রস্রবণের ধারা কমতে থাকে। ভূগর্ভস্থ জলের তল নেমে যায়। সাহারা রূপান্তরিত হয় রুক্ষ মরুভূমিতে।

সেখানে সর্বত্রই যে বৃষ্টির পরিমাণ কম সেটা অবশ্য নয়। সাহারার দক্ষিণে ১৮ থেকে ১২ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের অন্তবর্তী অঞ্চলে এখনও বৃষ্টি হয় নিয়মিত। প্রতি গ্রীষ্মেই এমনটি হয়। এর ফলে ওই সব অঞ্চলে কিছু গাছ-পালা জন্মায়। এই গাছপালা যাযাবরদের পালিত পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোথাও বা ভূগর্ভস্থ জল তুলে যতটা সম্ভব চাষবাসেরও চেষ্টা চলছে। আমাদের থর মরুভূমিরও বহু জমিতে এইভাবে জল সরবরাহ করে

গত কুড়ি বছরে যব, ভুট্টা, জোয়ার এবং আখের চাষ করা হচ্ছে। আরো ভূগর্ভস্থ জলের উৎস আবিষ্কার করে পৃথিবীর বিভিন্ন মরু অঞ্চলে যাতে চাষের সম্প্রসারণ ঘটান যায় তার জন্য অর্থনৈতিক সাহায্যও দিয়ে আসছেন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রকল্প (United Nations Development Programme or UNDP)।

মুশকিল এই, প্রচলিত পদ্ধতিতে মরুভূমির ভূগর্ভস্থ জল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সব সময় সম্ভব হয় না। সাধারণ ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জল তোলার সঙ্গে সঙ্গে অথবা স্বল্পকালের মধ্যে উৎসের ঘাটতি জল পূরণ হয় নানা ভাবে। বর্ষার জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করে ঘাটতি মেটায়। কোথাও বা দীর্ঘ অঞ্চলে ভূগর্ভে থাকে জলের ধারা। সে জল দূরবর্তী নদী থেকে আসতে পারে, পাহাড় পর্বতে হিমবাহ গলে যে জল সৃষ্টি হয় সেই জলও পূরণ করতে পারে ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয়। ভূগর্ভে কোন পথে জলের ধারা প্রবাহিত হয়, কী ভাবে, কত সময়ে এবং কোন উৎস থেকে প্রবাহিত হয় সে সব জানা গেলে কোথায় ভূগর্ভস্থ জল কাজে লাগান যায় সেটা নির্ধারণ করা সম্ভব। এ ব্যাপারে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ট্রাইটিয়াম (Tritium) অনেকটা নির্ভরযোগ্য।

ট্রাইটিয়াম হাইড্রোজেনেরই একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। যার ভর ৩ এবং অর্ধজীবন (half life) ১২·৪৩ বছর। ১৯৬৩ সালের মধ্যে ঊর্ধ্বাকাশে নিয়মিত পরীক্ষামূলকভাবে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর দরুন বাতাসে ট্রাইটিয়ামের পরিমাণ অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। বিস্ফোরণের আগে সারা পৃথিবীর বাতাসে তেজস্ক্রিয় এই বস্তুটির মোট পরিমাণ ছিল ৩ থেকে ৪ কিলোগ্রাম। বোমা বিস্ফোরণের দরুন সর্বোচ্চ পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৯৬৩ সালে। ওই বছর বৃষ্টির জল পরীক্ষা করে উত্তর গোলার্ধে ট্রাইটিয়ামের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১০০০ গুণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬৩র পর বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা বন্ধ করা হয়। তারপর থেকে বাতাসে ট্রাইটিয়ামের মাত্রা ক্রমে কমে আসছে। উল্লেখ্য, মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে নিয়ত এই গ্যাসটি তৈরি হয়ে থাকে। পরিমাণে অবশ্য খুবই নগণ্য।

প্রাকৃতিক জল, বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ জলে খুব কম পরিমাণ ট্রাইটিয়ামই দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। আধুনিকতম পদ্ধতিতে জলে ১০০০০০০০০০০০০০০০০০০টি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে যদি একটিও ট্রাইটিয়াম পরমাণু থাকে তা জানা যায়। ভূগর্ভস্থ জলে ট্রাইটিয়াম ধরা পড়লে বুঝতে হবে সেই জল নতুন। অর্থাৎ ১৯৫২ সালের পর কোন এক সময়ে ভূগর্ভে সঞ্চিত হয়েছিল। যদি ট্রাইটিয়াম না পাওয়া যায়, বুঝতে হবে ভূগর্ভে জল পুরনো। কম করেও ৩০ বছর আগে বৃষ্টি বা অন্য কোন উৎস থেকে সেই জল ভূস্তরে প্রবেশ করে, সঞ্চিত

হয়েছে। মজার ব্যাপার এই, বিজ্ঞানীরা সাহারার অগভীর ভূস্তর থেকে জল সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেছিলেন। সে জলে এতটুকু ট্রাইটিয়ামও পাওয়া যায়নি। যার অর্থ গত তিরিশ বছরে সাহারা অঞ্চলে যতটুকু বৃষ্টিপাত হয়েছে তার সবটাই বাষ্পীভূত হয়ে গেছে, ভূস্তর চুঁইয়ে এতটুকু জল অগভীর অঞ্চলেও প্রবেশ করতে পারেনি।

সঞ্চিত জলের বয়স নির্ধারণের জন্যে আরও একটি পদ্ধতি কাজে লাগান হয়। জলের দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে কিছু পরিমাণ কার্বন-১৪। এটিও তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ। এর অর্ধ-জীবন ৫৭৩০ বছর। এই আইসোটোপটিও মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে সৃষ্ট হয়ে থাকে। আর তার মূলে কাজ করে পারমাণবিক বিক্রিয়াটি সংক্ষেপে এই রকম: বাতাসের অন্যতম উপাদান নাইট্রোজেন-১৪ (N 14)। মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে থাকে প্রচণ্ড তেজসম্পন্ন নিউট্রন কণা। এই নিউট্রন নাইট্রোজেন-১৪ পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আঘাত করলে সেই নিউক্লিয়াস নিউট্রন কণাটি তাৎক্ষণিকভাবে শোষণ করে নেয়। নিয়ে তৈরি করে তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ নাইট্রোজেন-১৫ (N 15)। এর পর নাইট্রোজেন-১৫ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে একটি প্রোটন কণা বেরিয়ে গিয়ে তৈরি করে তেজষ্ক্রিয় কার্বন-১৪। আধুনিক
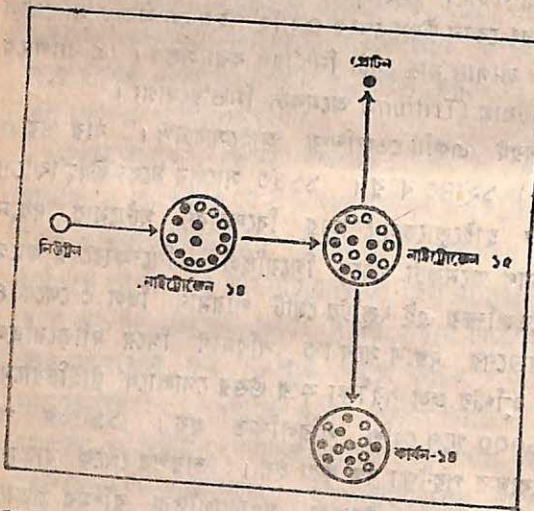
বায়ুমণ্ডলে এই কার্বন-১৪র পরিমাণ খুবই কম। ১০০০০০০০০০০০০টি কার্বন-১২র মধ্যে থাকে একটি মাত্র কার্বন-১৪ পরমাণু। বলাবাহুল্য তেজষ্ক্রিয় এই কার্বনও কার্বনডাইঅকসাইড গ্যাস তৈরি করে। সালোক-সংশ্লেষণের সময় এবং শ্বসন কার্যে উদ্ভিদ তেজষ্ক্রিয় কার্বন-১৪ সমন্বিত কার্বনডাইঅকসাইড গ্রহণ করে। উদ্ভিদ থেকে তা আসে মাটিতে। পরে জলে। জলে এই কার্বনডাইঅকসাইড বাইকার্বনেট হিসেবে দ্রবীভূত থাকে। জলে দ্রবীভূত কার্বন-১৪র পরিমাপ করেও বলে দেওয়া যায় জলের বয়স কত। অবশ্য যে জলের বয়স ২০০০ থেকে ৩০০০ বছরের বেশি সেই জলের বয়সই এই পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্য ভাবে মাপা যেতে পারে। এই পদ্ধতির সাহায্যে ৩০০০০

বছরের পুরনো জলের বয়স মাপা যায়। সম্ভবত ৭০০০০ বছর পুরনো
জলেরও বয়স মাপা যেতে পারে। এ ছাড়া কোন অঞ্চলের জলে ডয়েটেরিয়াম
এবং হাইড্রোজেনের অনুপাত অথবা অকসিজেন-১৮ এবং অকসিজেন-১৬র অনু-
পাত জেনেও সেই জল কত পুরানো তা জানা যায়। দেখা গেছে মরুভূমির
গভীরে এমন জলও পাওয়া গেছে যার বয়স কয়েক হাজার বছর। অর্থাৎ
হাজার হাজার বছর আগে বৃষ্টি অথবা অন্য কোন উৎস থেকে এসে ভূস্তরের
গভীরে সেই জল সঞ্চিত হয়েছিল এবং এতকাল সেখানেই আটক হয়ে রয়েছে।
বাষ্প হয়ে কোথাও চলে যায়নি। কিংবা ভূগর্ভস্থ জলধারার প্রবাহে স্থান-
ত্যাগ করেনি। জলে তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ ডয়েটেরিয়াম অথবা অকসিজেন-
১৮র পরিমাণ যত কম তার বয়সও তত বেশি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনে-
সকো এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক পার-
মাণবিক শক্তি সংস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন মরুভূমি এবং বিশেষ করে সাহারার মরু
এবং প্রায়-মরু অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের সন্ধান করেছে। ওঁরা দেখেছেন ওই
জল খুবই প্রাচীন। নতুন জলে যতটা কার্বন-১৪ পাওয়া যায় সে তুলনায়
সেখানকার বহু অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলে কার্বন-১৪ পাওয়া গেছে ২ শতাংশের
মত কম। যার অর্থ ওই সব অঞ্চলের জলের বয়েস ২০০০০ বছরেরও বেশি। এ
থেকে মনে হয় সেখানে জলের প্রথম সঞ্চয় ঘটে দশ থেকে পঁয়ষট্টি হাজার বছর
আগে।

তেজষ্ক্রিয় কার্বন-১৪, ডয়েটেরিয়াম এবং অকসিজেন-১৮র পরিমাণ হিসেব
করে প্রাচীন সাহারার ভূগর্ভস্থ জলের গতিবিধি সম্পর্কে অনেক তথ্য আবিষ্কার
করেছেন আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা। ওঁরা পশ্চিম সাহারার ভূস্তরের
নিচে দীর্ঘ জলস্তরের সন্ধান পেয়েছেন। এই জলস্তর অ্যাটলাস থেকে আহগার
পর্যন্ত বিস্তৃত। বিস্তৃত টিউনিসিয়া থেকে পশ্চিম লিবিয়া হয়ে ওয়াদিসরি
উপত্যকা পর্যন্ত। এ সব অঞ্চলের মোট বিস্তৃতি ৬০০০০০ বর্গ কিলোমিটার।
অর্থাৎ ফ্রান্সের বিস্তৃতির চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি। এই সংস্থা টাউগোরাট-
এর কাছে মরুভূমির ভূগর্ভে প্রায় ১৫০০ মিটার গভীরে জলের সন্ধান
পেয়েছেন। এই জলের তাপমাত্রা ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি। এর
কাছাকাছি অঞ্চলে নতুন জলেরও সন্ধান দিয়েছেন তাঁরা। এই জলে কার্বন-১৪-
এর মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি। এতে বোঝা যায় ওই অঞ্চলে নিয়মিত
নতুন জল সঞ্চিত হয়। নতুন জলের উৎসও আবিষ্কৃত হয়েছে।

সম্প্রতি তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে লিবিয়া আরব জামাহিরিয়ার
মরু অঞ্চলের ভূগর্ভে বিস্তৃত জলস্তরের একটি মানচিত্র তৈরি করাও সম্ভব
হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মরুভূমির বাইরের ভূপ্রকৃতি শুষ্ক রুক্ষ
মনে হলেও তার নিচে বহু জায়গায় জলের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তেজষ্ক্রিয়

পদ্ধতির সাহায্যে এখন সহজেই বলা যায় কোথায় কতটা জল, সেই জল পুরনো না নতুন। নতুন জলের সন্ধান পাওয়া গেলে বলা যেতে পারে কোথা থেকে এলো সেই নতুন জল, নিয়মিতই বা আসছে কিনা। অথবা জানা যেতে পারে সঞ্চিত জল ভূস্তরের কত গভীরে অবস্থান করছে, তার পরিমাণই বা কত। এ সব তথ্য মরুভূমির বিভিন্ন অঞ্চলের জল সম্পদ ব্যবহারে সাহায্য করবে।

শুধু মরুভূমিই নয়। বৃষ্টি কম পড়লে মরুভূমি নয় এমন জমিতেও পড়ে জলের টান। যে বছর বর্ষণ ঘটে বেশি সে বছর নদীনালা, হ্রদ পুকুর পুষ্করিণীতে থাকে জল। খরায় জলে পড়ে টান। তখন নির্ভর করতে হয় ভূগর্ভস্থ জলের উপর। গভীর এবং অগভীর নলকূপের সাহায্য খাবার এবং চাষের জল সংগ্রহ করতে গিয়ে বহু অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের তল ইতিমধ্যেই অনেক নিচে নেমে গেছে। খুব বেশি নিচে নামলে পরবর্তী মরসুমে অতিরিক্ত বর্ষা হলে ভূস্তরের জলের অতিরিক্ত ঘাটতি মেটান কোন কোন অঞ্চলে হয়ত অসম্ভবও হতে পারে। আর তা যদি হয় তখন গভীর নলকূপও আমাদের জল যোগাতে পারবে না। এর ফলে শস্যশ্যামল জমিও ক্রমে প্রায়-মরু অথবা মরু অঞ্চলে রূপান্তরিত হতে পারে।

অতএব ভূগর্ভে কতটা জল সঞ্চিত হয়, কতটা তুললে আবার তার ঘাটতি পূরণ করা যায় সে সব জানতে গিয়েও তেজস্ক্রিয় পদ্ধতি কাজে লাগাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। এ ব্যাপারে হায়দারাবাদের ন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভূমিকাও উল্লেখ করার মত।

তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে পরিবেশ দূষিত করা চলবে না, চলবে না।
পারমাণবিক শক্তি চালিত গাড়ি তৈরি বন্ধ কর, বন্ধ কর।
পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র চাই না, চাই না।

শ্লোগান। তবে এ শ্লোগান কলকাতার রাজপথে নয়। ভারতীয় কোন শহরেও নয়। খোদ পশ্চিম জার্মানিতে। অটো হ্যানের জার্মানি। ফ্রিটজ স্ট্রাসমানের সহযোগিতায় ১৯৩৮ সালে ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর ওপর নিউট্রন কণা আঘাত করে যিনি প্রথম কৃত্রিম উপায়ে পারমাণবিক বিভাজন ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই জার্মানিতে বসেই ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর ওপর নিউট্রন কণার বর্ষণ ঘটিয়েছিলেন হ্যান। দেখলেন, নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়াম-২৩৮ পরমাণু বিভাজিত হল। বিভাজিত হয়ে তৈরি করল সম্পূর্ণ আলাদা দুটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু। বেরিয়াম-১৪৫ এবং ক্রিপটন-৯৪। দুটিই প্রচণ্ড তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে এই ঘটনা। এই ঘটনাই পারমাণবিক বিজ্ঞানকে তাত্ত্বিক আঙ্গিনা থেকে টেনে নিয়ে এল প্রয়োগের পটভূমিতে। বিজ্ঞানীরা অল্পদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করলেন, হ্যান-স্ট্রাসমানের পরীক্ষা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। পারমাণবিক বিভাজনকে শক্তির প্রচণ্ড উৎস হিসেবে কাজে লাগান যেতে পারে।

হিরোসিমা নাগাসাকির কথা থাক। ১৯৪৫ সালের সেই ঘটনা পরমাণু-বিজ্ঞানের এক কলঙ্কময় ইতিহাস। হয়ত বা বড় রকমের একটি দৃষ্টান্ত। বিজ্ঞানের ওপর রাজনীতিকদের কর্তৃত্ব যে কত বড় বিপর্যয় ঘটাতে পারে, তার দৃষ্টান্ত। তবে এই ঘটনার কয়েক বছরের মধ্যেই অনেকেই বুঝতে পারলেন, শুধু ধ্বংস নয়, মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের এই বিশেষ আঙ্গিনাটির ভূমিকা সুদূরপ্রসারী।

সুদূরপ্রসারী যে, সেটা এখন প্রমাণিত। অটো হ্যান এবং স্ট্রাসমানের সেই পরীক্ষার পর এই আটত্রিশ বছরে পরমাণু বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ এখন বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করছে। ক্যানসার রোগের চিকিৎসা করছে। নতুন নতুন তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করে তাদের বিকিরণের সাহায্যে নানারকম ফসলের বীজে প্রজননগত পরিবর্তন ঘটিয়ে তৈরি করছে অধিক ফলনশীল বীজ। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি থেকে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, দুরারোগ্য রোগ নির্ণয়—পরমাণু বিজ্ঞানের গতিবিধি এখন যেন সর্বত্র। বিশেষ করে শক্তির বিকল্প উৎস হিসেবে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের পরই তো এখন পারমাণবিক শক্তির স্থান। মার্কিন দেশ, সোভিয়েত দেশ, ব্রিটেন, কানাডা, জাপান, পশ্চিম জার্মানি ভারত—পারমাণবিক প্রযুক্তি

বিজ্ঞানে যারাই স্বাবলম্বী তারা সবাই পরমাণবিক শক্তির ব্যাপারে এখন যথেষ্ট আশাবাদী।

তবু সংশয়।

সংশয় এখন খোদ পশ্চিম জার্মানিতে। সংশয় তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের ব্যাপারে।

*

হামবুর্গ। ৪ সেপটেম্বর, ১৯৭৭।

পশ্চিম জার্মানি সরকার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে দেশের কয়েকটি গবেষণাকেন্দ্র এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখার নিমন্ত্রণ। ফ্রাংকফুর্ট, বন, কোলোন, ডুসেলডরফ, পশ্চিম বার্লিন (কয়েক ঘণ্টার জন্যে পূর্ব বার্লিনেও), ম্যুনিখ, লুবেক, প্রভৃতি অঞ্চল ঘোরার ফাঁকে দিন চারেকের জন্যে গিয়েছিলাম হামবুর্গ।

এই হামবুর্গেই সামনে পড়লাম সেই মিছিলটার।

শ' পাঁচেক লোক। ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক এবং অন্যান্যরা। হাতে প্ল্যাকার্ড, বুকে এবং পিঠে প্ল্যাকার্ড। আটলাণ্টিক হোটেলের সামনে দিয়ে সগর্জনে এগিয়ে চলেছে। শ্লোগান ঃ

তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে পরিবেশ দূষিত করা চলবে না, চলবে না।

পারমাণবিক শক্তি চালিত গাড়ি তৈরি বন্ধ কর, বন্ধ কর।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র চাই না, চাই না।

অবাক কাণ্ড! খোদ জার্মানিতে এই শ্লোগান কেন?

রেল স্টেশনের সামনে কফহফ বিপণি কেন্দ্রে জনৈক প্রবীণ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, কারণ দুটি। এক, নানা রকম শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন গবেষণাগারে আমরা এখন মুড়িমুড়কির মত তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করছি। এর ফলে হাজার হাজার মানুষকে এখন তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের বর্ষণের মধ্যে চলাফেরা করতে হচ্ছে। এই বিকিরণ যে তাদের ক্ষতি করছে না, তার প্রমাণ কি? দুই, শক্তি উৎপাদনের জন্য এখন একের পর পর পারমাণবিক চুল্লি তৈরি হচ্ছে। এই সব চুল্লি থেকে বেরিয়ে আসবে পারমাণবিক জঞ্জাল। তেজষ্ক্রিয়। শেষ পর্যন্ত সেই জঞ্জাল যে মানুষ, পশু-পাখী এবং উদ্ভিদের ক্ষতি করবে না, তার গ্যারাণ্টি কোথায়?

'তারপর', ভদ্রলোকের স্বগতোক্তি, 'আর একটা ভয়ের কথাও আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। প্লুটোনিয়াম। পারমাণবিক চুল্লিতে যে বিক্রিয়া চলে তার মূল হোতা তো ওই নিউট্রন। নিউট্রনের সঙ্গে পারমাণবিক বিক্রিয়া করে ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর কিছু অংশ রূপান্তরিত হয়। তৈরি করে প্লুটোনিয়াম। যা দিয়ে পরমাণু বোমা তৈরি করা যায়। বুঝতেই পারছেন, এসব মারাত্মক জিনিসপত্র

না থাকাই ভাল। কোন সময়ে কার কি মতিগতি হয়, বলা তো যায় না? ইতিহাসে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে।'

আপনি কি পরমাণু বিজ্ঞানী? আমার প্রশ্ন।

না। আমি ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেনা বিভাগে কাজ করতে হয়েছিল আমাকে। এখন একটি স্কুলে ইতিহাস পড়াই। আমার ধারণা, যুদ্ধের উপকরণ থাকলেই হাত পা নিসপিস করে। বললেন সেই ভদ্রলোক।

দেখলাম পরমাণু বিজ্ঞানের অনেক খুঁটিনাটি খবরই তিনি রাখেন। টেকনিক্যাল খবর।

*

রাজনীতি থাক।

প্রসঙ্গটির টেকনিক্যাল দিকটি নিয়েই আলোচনা করার সুযোগ পেলাম পশ্চিম বার্লিনে। সেখানকার পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্র হ্যান-মাইৎনার ইনস-টিটিউটের জনৈক বিজ্ঞানীর সঙ্গে।

হামবুর্গের প্রসঙ্গটি তুলতেই ভদ্রলোক কিছুটা গম্ভীর হলেন। কিছুটা বিব্রত যেন।

আমি বললাম, বোমাটোমার কথা থাক। ওটা রাজনৈতিক প্রশ্ন। রাজনীতিকরা যতদিন বিজ্ঞানীদের ওপর খবরদারি করবেন, ও আশঙ্কা ততদিন থাকবে। আমি সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। আমার প্রশ্ন ওই তেজষ্ক্রিয় বিকিরণজনিত ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে।

আমার কথায় ভদ্রলোক আশ্বস্ত হলেন। বললেন, দেখুন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা তেজষ্ক্রিয় বিকিরণজনিত প্রতিক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। এক, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। যার ফলে বিকিরণের স্পর্শ পাওয়ার অনতিবিলম্বে দৈহিক ক্ষয়ক্ষতি হয়। দুই, বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া। যেমন ধরুন, কারোর দেহে তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ গিয়ে পড়ল। মাত্রায় কম। এক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গেই যে প্রতিক্রিয়া ধরা পড়বে, সে কথা বলা যায় না। প্রতিক্রিয়া ধরা পড়বে দীর্ঘদিন পর। অনেক সময় বিকিরণের স্পর্শ পাওয়ার পঞ্চাশ বছর পরেও তা ঘটতে পারে। তিন, প্রজননগত প্রতিক্রিয়া। এর ফলে যিনি তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের স্পর্শ পান, তিনি নিজে এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন না। ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাঁদের সন্তান-সন্ততি। তাঁদের বংশধরদের মধ্যে তেজষ্ক্রিয়জনিত বৈক্লব্য ধরা পড়ে।

চিকিসাকেন্দ্র এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের সান্নিধ্যে যাঁদের কাজ করতে হয়, তাঁদের বিকিরণজনিত দৈহিক প্রতিক্রিয়ায় ভোগার আশঙ্কা থাকে। এ ঘটনা প্রথম ধরা পড়েছিল ১৮৯৬ সালে। একস-রশ্মি আবিষ্কৃত হওয়ার এক বছর পর। একস-রশ্মি নিয়ে যাঁরা কাজ করতেন, দেখা গেল নানা

রকম দৈহিক রোগে তাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন। কারো গায়ের চামড়া পুড়ে গেলে যেমনটি দেখায় তেমনটি হয়েছে। অথবা ক্ষত। পরে তাঁদের মধ্যে ধরা পড়েছে নানা রকম উপসর্গ। শরীর দুর্বল, গা বমি বমি করা, ইত্যাদি। ১৯০৩ সালের মধ্যে নানা রকম পশুর ওপর তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ প্রয়োগ করে পরীক্ষা চালান হয়। তাতে দেখা যায় ওই বিকিরণ হাড়ের বৃদ্ধি রোধ করে। ১৯০৫ সালে প্রমাণিত হয়, এই বিকিরণের প্রভাবে রক্তের ক্ষতি হয়। পরে এটাও প্রমাণিত হয়েছে, সন্তানসম্ভবা মা'র শরীরে অতিরিক্ত বিকিরণ পড়লে, সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার দৈহিক বৃদ্ধি শ্লথ হয়। মানসিক বিকাশ বাধা পায়। এছাড়া শরীরের কোমল কোষকলা, চোখ, জননেন্দ্রিয়, মেয়েদের স্তন, বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি বা গ্ল্যানডস এবং রক্ত তৈরির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

'না', ভদ্রলোক বললেন, 'বিকিরণের সান্নিধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যে তার প্রতিক্রিয়া সব সময় দেখতে পাবেন, সব সময় সেটা ঠিক নয়। অনেক সময় তার প্রতিক্রিয়াজনিত উপসর্গ কয়েক সপ্তাহ পরেও ধরা পড়তে পারে। মানে, শারীরিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয় বিকিরণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। চিকিৎসা সংক্রান্ত উপসর্গ ধরা পড়ে কিছু দিন পর। যেমন ধরুন টিউমার। বিকিরণের পর শরীরে টিউমার গড়ে উঠতে কখনও কখনও পাঁচ বছরও লেগে যায়।'

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শরীরের সমস্ত অংশে ২৫ থেকে ৫০ রয়েন্টগেন-এর মত বিকিরণ পড়লে রক্তের শ্বেত কণিকারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শরীর দুর্বল হয়, মাংসপেশী নরম হয়ে পড়ে। গত কয়েক বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তেজষ্ক্রিয়তাজনিত দুর্ঘটনার সমীক্ষা করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা। তাতে দেখা গেছে, সারা দেহে বিকিরণের মাত্রা ৪০০ থেকে ৬০০ রয়েন্টগেন থাকলে শতকরা ৫০ জনের ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে। ৬০০ থেকে ৭০০ রয়েন্টগেনের ক্ষেত্রে মৃত্যু নিশ্চিত। তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ বলতে এখানে মুখ্যত একস-রশ্মি, বিটা-রশ্মি এবং গামা-রশ্মির কথাই বলা হচ্ছে।

বিলম্বিত দৈহিক ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের কাছে আজও একটি বড় রকমের রহস্য। এটা নানাভাবে ঘটতে পারে। যেমন ধরুন, কারোর শরীরের ওপর বাইরের কোন উৎস থেকে সরাসরি কোন তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ এসে পড়ল। এই বিকিরণের প্রভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে শরীরের কোন কোষকলার ক্ষতি হল। কিন্তু তখনকার মত কোন উপসর্গই ধরা পড়ল না। অতঃপর ওই প্রাথমিক ক্ষতিই দিনের পর দিন শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া চালিয়ে যেতে লাগল। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। অবশেষে একদিন ধরা পড়ল তার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। অনেক সময় এমনও হতে পারে, বাতাস অথবা জল অথবা খাবারের সঙ্গে শরীরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল যৎসামান্য রেডিও-আইসোটোপ। এই আইসো-

টোপ কোন গবেষণাগারের পরিবেশেও সবার অলক্ষ্যে ছড়িয়ে থাকতে পারে, অথবা পারমাণবিক চুল্লি বা কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে। এই সব কণা শরীরের মধ্যে গিয়ে হয়ত বাস করতে লাগল এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গত করতে শুরু করল তেজষ্ক্রিয় রশ্মি। দিনের পর দিন এইভাবে চলতে চলতে যা শেষ পর্যন্ত শারীরবৃত্তে ঘটিয়ে বসল দুর্ঘটনা। সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যত তিন রকম উপসর্গের সম্ভাবনা থাকে। লিউকোমিয়া, দূষিত টিউমার এবং স্বল্পায়ুতা।

'তবে তার চেয়েও বড় সমস্যা ওই প্রজননগত ব্যাপারটা।' বললেন হ্যান-মাইৎনার ইনস্টিটিউটের সেই বিজ্ঞানী। এক্ষেত্রে বিকিরণের পরিমাণটা সব সময় বড় কথা নয়। অনেক সময় যৎসামান্য বিকিরণেও বিপর্যয় ঘটতে পারে। এই বিপর্যয়কে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা দুই ভাগে ভাগ করেন ঃ ক্রোমোজোম মিউটেশন এবং পয়েন্ট মিউটেশন। প্রথমটিতে বিকিরণের ফলে পুরো ক্রোমোজোমই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষতির ব্যাপারটা অণুবিক্ষণ যন্ত্রে দেখাও যেতে পারে। অনেক সময় ক্ষতির হাত থেকে মুক্তিও পায় ক্রোমোজোম। কখনও বা যে কোষের মধ্যে সে বাস করে সেই কোষের মৃত্যু ঘটায়। আবার কখনও বা ক্ষতিগ্রস্ত এই ক্রোমোজোম কোনভাবে জননকোষে গিয়ে বাসা বাঁধে এবং বংশগতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বাবা অথবা মা, কিংবা উভয়ের শরীর থেকে বিকৃত এই ক্রোমোজোম সন্তানদের দেহে পরিবাহিত হয়।

'যার প্রভাবে ওই সব সন্তানদের কেউ হয় স্বল্পায়ু, কেউ দৈহিক এবং মানসিক বৈক্লব্যের আকর, অথবা নানা রকম রোগের শিকার। পয়েন্ট মিউটেশনের ক্ষেত্রে পুরো ক্রোমেজোমের অবশ্য ক্ষতি হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম বেঁচে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় 'জিন'। ক্ষতিগ্রস্ত এই 'জিন' বন্ধ্যাত্ব ঘটাতে পারে, অথবা বংশধরদের মধ্যে প্রজননজনিত ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারে।

'কিন্তু এ নিয়ে ভয় পাওয়ার কি কারণ আছে?' মন্তব্য করলেন হ্যান-মাইৎনার-এর সেই বিজ্ঞানী। 'পৃথিবীর ভূস্তর থেকেই তো আবহমান কাল স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকীর্ণ হচ্ছে তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ। সূর্য প্রতি মুহূর্তে তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ ছুঁড়ে দিচ্ছে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে। মহাজাগতিক পরিমণ্ডল থেকেও ঝরে পড়ছে ওই একই জিনিস। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে প্রাকৃতিক বিকিরণের মাত্রা, গবেষাণাগার অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ বিকিরণের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি। তাই যদি হয়, তাহলে পারমাণবিক চুল্লি, পারমাণবিক গবেষণা মানুষকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এসব কথা বলার মানে কি? পরমাণু বিজ্ঞান নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাচ্ছেন। এর ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধেও তাঁরা সজাগ। জনস্বাস্থ্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানুষের তৈরি তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের হাত

থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে আগের চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখেন। এ ব্যাপারে যেসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সে সব ব্যবস্থা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য।'

'তাহলে এই বিক্ষোভ কেন?' বার্লিনে বসেই প্রশ্ন করেছিলাম জনৈক নিউক্লিয়ার মেডিসিন-বিশেষজ্ঞকে।

তাঁর উত্তর : সমস্যা আছে। চিকিৎসা কেন্দ্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র। ইদানীং পারমাণবিক শক্তি চালিত জাহাজ তৈরিতেও আমরা হাত দিয়েছি। মানুষের কাছে এসবই মাত্র কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা। তার ওপর নির্ভর করে এসব উদ্যোগ তেজষ্ক্রিয়তার দিক দিয়ে কতটা ক্ষতি করতে পারে, কতটা পারে না, সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের মধ্যেও প্রাণী অথবা উদ্ভিদ বেঁচে থাকে ঠিক কথা। সম্ভবত এটা তাদের 'অ্যাডাপ্টেবিলিটি'র ক্ষমতা। প্রকৃতিই সে ক্ষমতা তাদের জুগিয়েছে। এ ক্ষমতা কিভাবে তারা পেল সেটা অনুসন্ধান করা দরকার। আমার বক্তব্য, গবেষণাগার অথবা পারমাণবিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে যাঁরা বাস করেন, সেই 'জনসাধারণ', অথবা অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদ কৃত্রিম তেজষ্ক্রিয়তার দরুন তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কি না, সে সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহের জন্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনশিক্ষা চালু করা দরকার।

স্বল্পমাত্রার তেজষ্ক্রিয় বিকিরণও কি বিপজ্জনক ?

পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরিবেশে ছড়ায় নানারকম আয়নকারী বা তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ। সেই বিকিরণের মাত্রাও অস্বাভাবিক রকমের বেশি। জীবজগতের উপর তার প্রভাব যে কতটা নিদারুণ হতে পারে তার সাক্ষী হিরোসিমা এবং নাগাসাকি।

কিন্তু প্রশ্ন হল, পরমাণু বোমাই তো তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের একমাত্র উৎস নয় ? প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিকীর্ণ আয়নকারী বা তেজষ্ক্রিয় রশ্মির বর্ষণে প্রতি মুহূর্তেই আমরা স্নান করছি। এ ছাড়াও রয়েছে মানুষের তৈরি উৎস। ক্যানসার নিরাময়ের জন্যে ব্যবহার করা হয় একস্ এবং নিউট্রন রশ্মি। রোগ নির্ধারণের জন্যে কাজে লাগান হয় কত রকমই না তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ বা সমস্থানিক পদার্থ—আইওডিন, বেরিয়াম প্রভৃতি। এই সব আইসোটোপ থেকেও নির্গত হয় তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ। পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলিও তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের অন্যতম উৎস। এই সব উৎস থেকে নির্গত তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের মাত্রা তুলনামূলকভাবে হয়ত অনেকটা কম। তবু ভয় একটা থাকেই। কারণ সবাই জানেন, তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ ক্যানসার সৃষ্টি করে, ঘটায় প্রজননগত ত্রুটি। তাই স্বল্পমাত্রার তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করে আসছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের সামনে এখন দুটি প্রশ্ন : এক। এমনও তো হতে পারে, স্বল্পমাত্রার বিকিরণ আমাদের শরীরে প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রতিক্রিয়া করে না ? আণবিক ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষতি করে প্রথমে। সেই ক্ষতি সৃষ্টি করে অপর কোন বিপর্যয়। আর এই ভাবে চলতে থাকে পর্যায়ক্রমিক ঘটনা। অবশেষে সৃষ্টি হয় কঠিন কোন রোগ। এক কথায় যাকে বলা যায় পুঞ্জীভূত প্রতিক্রিয়া বা Cummulative effect। দুই। এটাও কি সম্ভব, এই বিকিরণ নির্দিষ্ট কোন মাত্রার বেশি হলে তবেই বিপজ্জনক হয় ? সঠিক বলা শক্ত। কারোর কারোর অভিমত, কোন কোন বিক্রিয়ার ক্ষয়ক্ষতি পুঞ্জীভূত প্রতিক্রিয়ারই ফলশ্রুতি। আবার কোন কোন বিকিরণ নির্দিষ্ট মাত্রায় পেঁছিলে তবেই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই।

তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ মুখ্যত দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর বিকিরণকে বলা হয় তড়িৎ-চৌম্বক (electromagnetic)। একস্ এবং গামারশ্মি এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই কম, কম্পাঙ্ক অত্যন্ত বেশি। অপর শ্রেণীর বিকিরণকে বলা হয় কণাবিকিরণ বা Particulate radiation। পারমাণবিক কণা, যেমন, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, আলফাকণা প্রভৃতি সৃষ্টি করে এই ধরনের বিকিরণ।

বলা বাহুল্য, আয়নকারী বিকিরণের পরিমাণ এবং মাত্রা মাপার ব্যাপারে বিভিন্ন 'একক' ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের বিকিরণের মধ্যে থাকে যথেষ্ট

শক্তি। কোন বস্তুর উপর এই বিকিরণ পড়লে ওই বস্তু যে সব পরমাণু দিয়ে তৈরি তারা সেই শক্তির আংশিক অথবা পুরোপুরি অংশ শোষণ করে। এর ফলে পরমাণুর এক বা একাধিক ইলেকট্রন বিতাড়িত হয়ে পরমাণু আয়নিত হয়। কখনও এক বা একাধিক ইলেকট্রন পরমাণুতে সংযোজিতও হতে পারে। যেমন ঘটে বিটা বিকিরণের (বিটা রশ্মি আসলে ইলেকট্রন কণার বর্ষণ) ক্ষেত্রে। এই আয়নিত করণের মাত্রা এবং পরিমাণ মাপার জন্যে সর্বপ্রথম যে এককটি ব্যবহার করা হয়েছিল তাকে বলা হয় 'রয়েণ্টগেন'। কোন তেজস্ক্রিয় রশ্মি কি পরিমাণ বাতাস আয়নিত করতে পারে সেটা মাপার জন্যেই এই 'একক'টির প্রবর্তন। প্রাণী এবং উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে যে 'একক'টি ব্যবহার করা হয় তার নাম র‍্যাড (rad)। প্রতি ১ গ্রাম কোষকলায় তেজস্ক্রিয় রশ্মির দরুন যদি ১০০ আর্গ শক্তি শোষিত হয় সে ক্ষেত্রে বলা হয় ওই কোষকলার তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা দাঁড়াল ১ র‍্যাড। গ্রে (gray) আরও একটি একক। ১ গ্রে সমান ১০০ র‍্যাড।

কোষকলায় বিকিরণের ক্ষয়ক্ষতি

কোষকলায় একস্ অথবা গামা রশ্মির ক্ষয়ক্ষতি
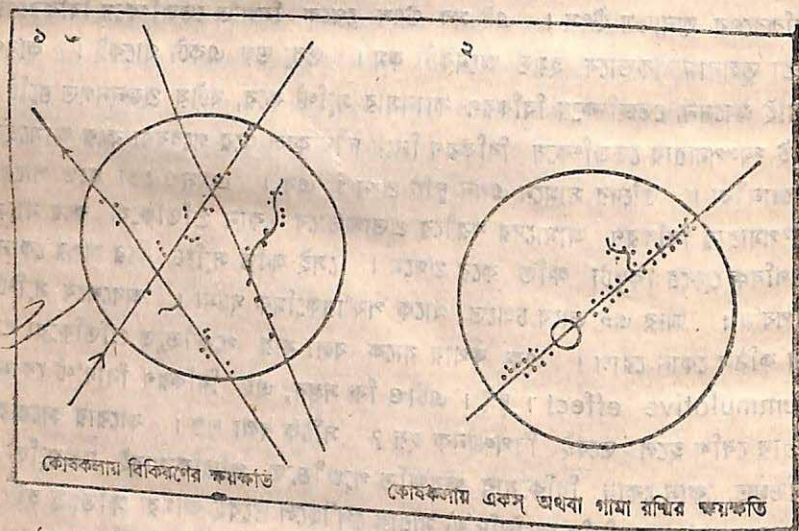
'একক' নির্ধারণের ব্যাপারে আর একটি দিকের কথাও বিবেচনা করা হয়। দেখা গেছে একই মাত্রার একস্ অথবা গামা রশ্মির চেয়ে কণাজাতীয় বিকিরণের (প্রোটন, নিউট্রন, আল্‌ফা কণা প্রভৃতি) কোষকলার ক্ষয়ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি। এদিকটি বিবেচনা করে কণাজাতীয় বিকিরণের পরিমাপের দুটি স্বতন্ত্র 'একক' ধরে নেওয়া হয়েছে। এদের যথাক্রমে বলা হয় 'রেম' (rem) এবং 'সিভার্ট' (sievert)। ১ র‍্যাড গামা রশ্মি জীবন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষে যতটা প্রতিক্রিয়া ঘটায় ১ 'রেম' তারই পরিমাপ। আর ১ 'সিভার্ট' ১ 'গ্রে' গামারশ্মির জীবকোষে যতটা প্রতিক্রিয়া ঘটায় তার পরিমাপ।

প্রকৃতির মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে স্বল্পমাত্রার নানারকম আয়নকারী বিকিরণ। ইংরেজিতে যাদের বলা হয় 'natural background radiation'। এদের মধ্যে অন্যতম মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic rays)। এ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভূস্তরে থাকে ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, থোরিয়াম এবং আরও নানারকম তেজষ্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ। তাদের থেকেও নিয়ত বিকীর্ণ হয় আয়নকারী রশ্মি। জীবদেহের মধ্যেও থাকে পটাশিয়াম-৪০, কার্বন-১৪ এবং বিভিন্ন তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ। এরাও তেজষ্ক্রিয় রশ্মির উৎস। যাঁরা সমভূমিতে বাস করেন, এই তিনটি উৎস থেকে যে পরিমাণ বিকিরণ তাঁদের দেহে শোষিত হয় তার পরিমাণ বছর প্রতি ৯.৮ মিলিসিভার্ট। যাঁদের বাস পাহাড় এবং মালভূমি অঞ্চলে, অথবা রেডিয়াম অধ্যুষিত এলাকায়, এই মাত্রা তাঁদের ক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়ায় দ্বিগুণের মত।

এ ছাড়াও রয়েছে আরও কিছু কিছু উৎস যা মানুষেরই সৃষ্টি। ক্যানসার থেকে শুরু করে নানারকম রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় একস্‌রশ্মি। কংক্রিটের বাড়ি তৈরি করার জন্যে ব্যবহার করা হয় পাথরকুচি। পাথরকুচি থেকেও নির্গত হয় তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের অন্যতম উৎস ফসফেট সার, টেলিভিশন সেট, পরমাণু বোমা থেকে সৃষ্ট তেজষ্ক্রিয় ভস্ম এবং পারমাণবিক চুল্লি।

তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের ব্যাপারে মানুষ সতর্ক হতে শুরু করে একস্‌-রশ্মি আবিষ্কারের পর। ১৮৯৫ সালে বিচিত্র এই রশ্মি আবিষ্কার করলেন ডব্লু. কে. রোয়েণ্টগেন। তার কয়েক মাসের মধ্যেই এই রশ্মির সাহায্যে রোগ চিকিৎসা করতে গিয়ে ধরা পড়ল গোলমাল। দেখা গেল, একস্‌-রশ্মি প্রয়োগ করার দরুন গায়ের ত্বক লাল হয়, ত্বকের উপর ছোপ ধরে। অবশ্য কিছুদিন পর এসব উপসর্গ সেরেও যায়। কিন্তু ১৯০২ নাগাদ দেখা গেল, তাৎক্ষণিক ভাবে বড় রকমের কোন ক্ষয়ক্ষতি ধরা না পড়লেও এই রশ্মির বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া হিসেবে (delayed effect) দেখা দেয় ক্যানসার। একস্‌-রশ্মি নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের হাতের ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধরা পড়ে ত্বকের ক্যানসার। এ থেকে অনেকের ধারণা হয়, সম্ভবত ক্রমান্বয়ে দীর্ঘদিন একস্‌-রশ্মির সংস্পর্শে থাকলে তবেই ক্যানসার হয়। একস্‌-রশ্মির মাত্রা বেশি হলেও এই রোগ হতে পারে। অর্থাৎ তেজষ্ক্রিয় রশ্মির মাত্রার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হল। ধরে নেওয়া হল, মাত্রা কম হলে তেজষ্ক্রিয় রশ্মি কোন ক্ষতি করে না।

কিন্তু ১৯৫০-এর দশকে বিতর্কের ঝড় তুললেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনসটিটিউট অব টেকনোলজির ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ই. বি. লিউইস। তিনি দেখালেন, হিরোসিমা এবং নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর দীর্ঘকাল পরেও যারা সুস্থ ছিল, তাদের অনেকে রক্তের ক্যানসারে (লিউকোমিয়া) আক্রান্ত হয়েছে। অনেক সুস্থদেহী রেডিওলজিস্টের শরীরে দেখা গেছে ক্যানসার।

এমন কি যে সব রোগীর শরীরে ক্যানসারের কোন লক্ষণই ছিল না, দেখা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে একস্-রশ্মির সাহায্যে চিকিৎসা করতে গিয়ে তারা ক্যানসারের শিকার হয়েছে। এই সব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে লিউইস বললেন, তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের মাত্রার সঙ্গে ক্যানসারের সম্পর্ক রয়েছে। এমনও হতে পারে, সামান্য বিকিরণের স্পর্শেই একটি মাত্র রক্ত-কোষেই দেখা দিল 'মিউটেশন' বা গাঠনিক পরিবর্তন। এই কোষই পরে বিভাজিত হতে শুরু করল। রক্তে ভরিয়ে তুলল অস্বাভাবিক কোষের মাত্রা। গড়ে তুলল লিউকোমিয়া। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে লিউইস একটি মতবাদও দাঁড় করান। এই মতবাদে বলা হয়, যে সব শিশু লিউকোমিয়া রোগে ভোগে, তাদের মধ্যে ১০ থেকে ২০ শতাংশ প্রাকৃতিক তেজষ্ক্রিয়তার দরুনই ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন কণা বিকিরণের আঘাতে বেরিয়ে গিয়ে সৃষ্টি করছে O H র‍্যাডিকাল। O H ডি.এন.এ অণুর সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে ডি.এন.এ-র আণবিক গঠন বিকৃত করে   ডি এন.এ
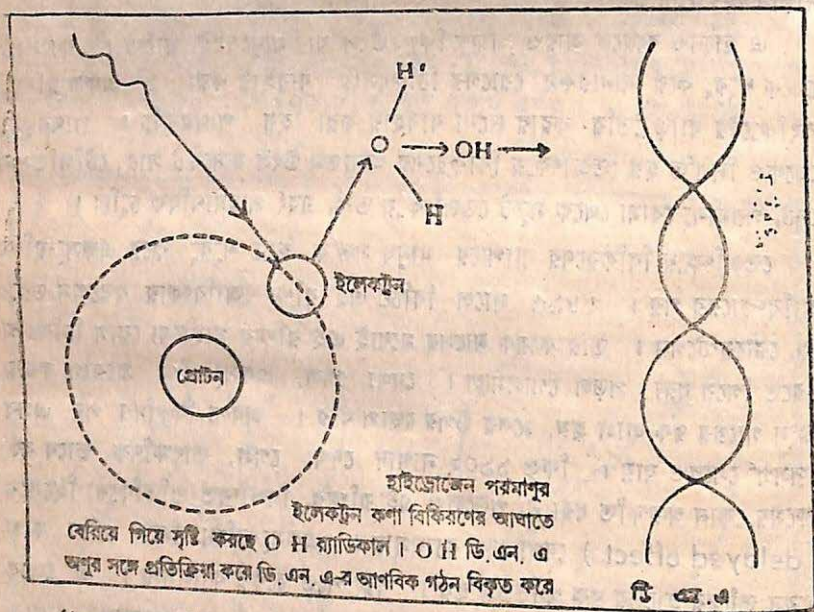
"মূল সমস্যাটি আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।" সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনসটিটিউট অব এনভাইরন্মেনটাল মেডিসিন'-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক আর্থার সি. আপটন। "এক। কারোর দেহ হয়ত তেজষ্ক্রিয় বিকিরণে স্নাত হল। এর ফলে তার দেহে প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা নাও যেতে পারে। বিশেষ করে তেজষ্ক্রিয়তার মাত্রা যদি কম হয়। এক্ষেত্রে যেটা সম্ভব সেটা হল, ওই বিকিরণের প্রভাব তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বর্তাতে পারে। তবে হ্যাঁ, তেজষ্ক্রিয়তার মাত্রা ন্যূনপক্ষে কতটা হলে তবেই এমন ঘটনা ঘটা সম্ভব তা বলা শক্ত। মনে হয়, যে কোন

মাত্রার বিকিরণেই এটা সম্ভব। দুই। বংশগত কারণ ছাড়াই অনেকে নানান রোগের শিকার হন। তার মূলে উচ্চতর মাত্রার আয়নকারী বিকিরণের যে ভূমিকা থাকে সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি। অতিরিক্ত বিকিরণ চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করে, বন্ধ্যাত্ব ঘটাতে পারে, রক্তের শ্বেত কণার সংখ্যা কমাতে পারে এবং মাতৃগর্ভে ক্রমবর্ধমান ভ্রূণের কোষকলার ক্ষতি করে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিতে পারে।'

কোষকলা নানারকম জৈবিক অণু দিয়ে তৈরি। আয়নকারী বিকিরণ শরীরে প্রবেশ করার পর তার সঞ্চারপথের সামনে যে সব অণু বা পরমাণু পড়ে তাদের সঙ্গে সৃষ্টি করে সংঘর্ষ। তখন বিকিরণ শক্তির প্রভাবে অণু এবং পরমাণু আয়নিত হয়। সৃষ্ট হয় বিক্রিয়াশীল রাসায়নিক 'র‍্যাডিক্যালস'। কোন কোন রাসায়নিক অণুর গঠনেও পরিবর্তন আসে। এর ফলে বিঘ্নিত হয় শরীরের স্বাভাবিক বিপাকীয় কাজকর্ম। গড়ে ওঠে ক্যানসার কোষ।

চিকিৎসার প্রয়োজনে অনেক সময় মাথা এবং গলায় একস্-রশ্মি প্রয়োগ করা হয়। একস্-রশ্মির মাত্রা অবশ্য খুবই কম থাকে। ০·৬ থেকে ০·২ সিভার্টের মত। তবু মাত্রার এতটা স্বল্পতা সত্ত্বেও এ ধরনের চিকিৎসা কখনও কখনও শিশুদের মধ্যে থাইরয়েড ক্যানসার সৃষ্টি করে। মায়েদের জরায়ু পরীক্ষা বা চিকিৎসায় লাগান হয় একস্-রশ্মি। মাত্রা ০·০১ থেকে ০·০৫ সিভার্টের মত। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসার পর দেখা গেছে অনেক মায়ের গর্ভের ক্রমবর্ধমান ভ্রূণ ক্যান-সারে আক্রান্ত হয়েছে।

"তবে এ কথাও ঠিক", বলেছেন অধ্যাপক আপটন, "ধরুন, শরীরের উপর নিক্ষিপ্ত হল কোন তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, তার প্রভাবে কোষকলার কিছুকিছু অণু ক্ষতিগ্রস্ত হল। প্রাকৃতিক নিয়মে এই ক্ষতিপূরণ করার জন্যে তখন কোষকলায় নিঃসৃত হয় নানা রকম এনজাইম। ক্ষতির পরিমাণ কম হলে এনজাইমই কোষের আণবিক ত্রুটি দূর করে। শরীর তখন রোগের হাত থেকে রেহাই পায়। শুধু মুশকিল, বিকিরণের মাত্রা কতটা কম হলে এ ধরনের নিরাময় সম্ভব, সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত আমরা কেউ নিশ্চিত নই। তা ছাড়া ব্যক্তি এবং বিকিরণ বিশেষে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও ভিন্নতর হয়।"

বলাবাহুল্য, এ সমস্যা অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও রয়েছে। পারমাণবিক যন্ত্র থেকে চুল্লি—সর্বত্র কাজ করছেন শত শত কর্মী। তাঁরা নিয়ত স্নাত হচ্ছেন স্বল্পমাত্রার আয়নকারী রশ্মিতে। এই বিকিরণ তাঁদের শরীরে সত্যিই কোন অঘটন ঘটাচ্ছে কিনা তা নিয়ে নিয়মিত অনুসন্ধান চালান দরকার। গবেষণাগারগুলিতেও নানা রকম বিকিরণ নিয়ে কাজ হয়। সেখানকার কর্মীরাও বিপদমুক্ত কিনা সে সম্পর্কেও অনুসন্ধান প্রয়োজন। □